বিভ্রম

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, বিধান সরণী . কলিকাতা—৬

বিভ্রম

এই লেখকের অন্যান্য বই

রাজা যায় বনবাসে

নীলকণ্ঠ পাখীর খোঁজে

অলৌকিক জলযান

সুখী রাজপুত্র

রোদ্দুরে জ্যোৎস্নায়

পৃথিবীর এক কোনে

ধ্বনি প্রতিধ্বনি

অভ্যন্তরে হত্যাকাণ্ড

উৎসর্গ

সুবন্ধু ভট্টাচার্য

সুহৃদবরেষু

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

| (টেবিলের) ওপর একগাদা ফাইল।) ফাইলের ভিতর প্রায় ডুবে ছিলাম। চোখে মুখে অন্ধকার দেখছি। ফিনান্স কর্পোরেশনেব লোন সম্পর্কীত দলিলপত্র ঘাটতে ঘাটতে জীবনটা এভাবে কাটবে, এই সব দলিল দস্তাবেজেব ভিতর জীবন কেটে যাবে ভেবে যখন তিক্ত মুখে বসেছিলাম তখন ফোন এল। আজকাল আর ফোন ধরতে ইচ্ছা হয় না। বিরক্ত মুখে ফোনটা ধবতেই ওপাশে মেজাজী গলা, কে কথা বলছ।

আমি সরল।

সে ত গলা শুনেই বুঝতে পাবছি। যাবে নাকি?

কোথায়!

ডায়মণ্ডহাববারে পিকনিক করতে যাচ্ছি।

পিকনিক্! না ভাই সময় নেই। একদিন ছুটি নিয়ে গেলে দশদিনেও কাজ তুলতে পাবব না।

খুব জমবে।

মানে।

মানে সুন্দরী যুবতীরা যাচ্ছে।

যাক। ঘরে আমার সুন্দরী যুবতী অপেক্ষা করে থাকেন।

সে ত তোমার আছে। আমাদের?

তোমরা যাও।

গেলে ভাল করতে। ওরা বলছিল তোমার কথা। তুমি গেলে ওরা খুব খুশী হবে।

ওরা বলতে তুই কাদের কথা বলতে চাস বুঝতে পারছি না।

শুভেন্দুদের কথা।

অঃ শুভেন্দু। শুভেন্দুর বৌ যাচ্ছে!

হু যাচ্ছে। শুভেন্দুর বৌ সম্পর্কে এত কৌতুহল কেন?

না, এমনি।

আমি চুপ করে থাকলে ফের ফোনে গলা ভেসে এল।

আমি ওদের কি বলব?

বলবি যেতে পারবে-না।

গেলে ভাল করতে। মণির গলা গাঢ় শোনাল।

মণি মানে মণিকা নয়। মনীন্দ্র। ওকে আমরা মণি বলে ডাকি। আমরা বন্ধুবান্ধবেরা মনীন্দ্রকে মণি না বললে সে রাগ করে। মনীন্দ্র আমাদের ভিতর সরল এবং সাহসী যোদ্ধা। একবার দার্জিলিঙে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমরা ছয় সাতজন বন্ধুতে বড় বড় পাহাড় চষে যখন ক্লান্ত আমাদের এই অকপট সরল সাহসী বন্ধু মণি তখন সব খাদ্য খাবার সংগ্রহ করেছে। দুপুর রাতে শীতে যখন কষ্ট পাচ্ছিলাম, ঘুম আসছিল না তখন এই মণি সকলকে 'হাম এক দিওয়ানা' এই হিন্দিগান গাইতে গাইতে চা করে দিয়েছে হিটারে।

মণি বলল ফের, শুধু কফিহাউস আর বাড়ি করছ। এবার একটু বের হও। তুমি ত শুনেছি দ্বিগবিজয়ী বীর ছিলে। বের হলে মনটাও ভাল লাগবে।

সত্যি কতদিন যেন কোথাও যাওয়া হয় না। বিয়ে করার পর থেকে বড় ঘরকুনো হয়ে গেছি। আগের মত আর কথায় কথায় হিল্লি দিল্লি পাড়ি দিতে পারি না। কথায় কথায় বাড়ি থেকে পালাতে পারি না। স্ত্রী নিয়তি আমার চেয়ে এক কাঠি ওপরে, সেও কোথাও যাওয়া পছন্দ করে না। বিয়ের পর পরই ওর পেটে বুনো চলে এল। সেই থেকে সে এবং বুনো একটা চুক্তি পত্রে মোটামুটি সই করে ফেলেছে। ওরা এখন পরস্পর প্রায় সমবয়সী বন্ধুর মত ব্যবহার করে। ওদের দেখলে বোঝাই যায় না, সংসারে নানা রকমের

ঝক্কি-ঝামেলা আছে, দেখলে বোঝা যায় না মানুষ দলিল দস্তাবেজের ভিতর বসবাস করছে, জীবন সহজ এবং সরল নয়।

তবে বলতে লজ্জা কি। সারাদিন খাটুনির পর আমার ঘর আমাকে বড় টানে। ছুটি বলতে কিছু নেই। তবু দুবার নিয়তিকে বলেছিলাম, চল পুরী ঘুরে আসি, অথবা রাজগীর। সে কিছুতেই সায় দেয় নি। কোথায় গিয়ে এমন একজন বেহিসেবী মানুষের সঙ্গে পড়বে ভাবতেই ওর ভয়। ওর বুনো, ওর মা এবং দুই ভাই মিলে ওর জগৎ। পরীক্ষা দিতে হয় দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ পার হয়ে সে যখন এই সংসারে, ছোট্ট একটি ফ্ল্যাট বাড়ির মালকিণ, বুনোর স্কুল, মাঝে মাঝে গড়ের মাঠ অথবা চিড়িয়াখানা, সময়ে অসময়ে দুটো একটা বাইস্কোপ এই মিলে নিয়তি মোটামুটি সুখী মনে হয়।

ওপাশ থেকে ফের গলা পাওয়া গেল, কি রে কথা বলছিস না কেন?

ভাবছি।

সারাজীবন ভেবে ভেবেই গেলে।

তাই যাবে দেখছি।

তোর যেতে আপত্তি কিসের।

হৈ চৈ করে বেড়াতে আর আজকাল তেমন আনন্দ পাই না।

কিন্তু শুভেন্দুর বৌ যে বলল, সরলবাবুকে সঙ্গে নেওয়া চাই। তোকে নিয়ে যাওয়ার ভারটা আমার ওপর।

আমাকে নিয়ে কি লাভ বল। আমি ত নীরস মানুষ।

কি জানি বাপু। তোর প্রতি কেন যে এত টান বুঝি না।

আমার শুভেন্দুর বৌর কথা মনে পড়ল। শুভেন্দুকে আমার চেনার কথা নয়। শুভেন্দু দুচারটে নাটক লিখেছে, আমি নাটক লিখি না। আমি গল্প এবং উপন্যাস লিখি। সুতরাং নাটক সম্পর্কে আমার একটা বিজাতীয় ভাবই মনে কেন জানি কেবল কাজ করে।

তবু শুভেন্দুর সঙ্গে এবং শুভেন্দুর বৌর সঙ্গে আমার আলাপ হয়ে গেল, এবং ভাল লেগে গেল। কবে যেন ঠিক এখন মনে করতে পারছি না, শুভেন্দু একদিন একটা কার্ড দিয়ে বলেছিল—যে কোনদিন চলে যাবেন মুক্তাঙ্গনে। আমরা লেখকদের জন্য একটা বেঞ্চ রিজার্ভ করে রাখি। গেলেই বসতে পারবেন।

এবার আমার শুভেন্দুর বৌর মুখটা মনে পড়ছে। খুব সুন্দরী নয়। কি যেন নাম—গীতা অথবা রীতা গোছের। কিন্তু অবাক, ওরা আমাকে মনে রেখেছে। আমি বললাম, শুভেন্দুর বৌর নাম কি যেন রে।

মণি উত্তরে গীতা অথবা রীতা বলল না। বলল, শালা।

এতক্ষণে আমি নামটা মনে করতে পারছি। সুতরাং এমন একটা পরিচয়ে হৈ হৈ করে বেড়াতে যাওয়া আমাব পছন্দ হচ্ছেনা। গলা নীচু করে দিলাম, তোরা যা না।

এবার মণি খুব রেখে গেল, তুই কি মনে করিস, তুই না গেলে আমাদের পিকনিক জমবে না।

আমি বলেছি তা।

তবে!

আমি সংসারী মানুষ আমাকে আর ঝুট ঝামেলাতে নাই বা টানলি।

তোমাকে যেতে হবে সরল। না গেলে তোমার মুখ দর্শন করব না।

মণির ঐ এক দোষ। যখন কথায় পারবে না, যখন নিজেকে অসহায় বোধ করবে তখন মান অভিমানের পালা। বললাম ঠিক আছে যাব। তবে রোববার দেখে গেলে আমার পক্ষে ভাল হয়।

সে না হয় করা যাবে।

এবার আমি শীলার মুখে বড় একটা সিঁদুরের টিপ দেখতে পেলাম। টানা ভুরু। রঙ শ্যামলা, চোখের নিচে সামান্য ভাঁজ,

নাকের ডগাটা আর একটু উঁচু হলে চোখের সঙ্গে মানাত। চুলে কি যেন একটা মনোরম তেলের গন্ধ ছিল সেদিন। টানা খোপা এবং শাড়ীতে কড়া মাড়ের জন্য খস খস শব্দটা প্রবল। শীলা নাটকের চত্বর থেকে আমাকে বাড়ি পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়েছিল। কথায় বার্তায় বুঝেছিলাম, শীলা আমার কিছু লেখা মনোযোগের সঙ্গে পড়েছে। গল্প সম্পর্কে কিছু বিতর্ক করার বাসনা ছিল। আমি ইচ্ছা করেই ওর কথায় সায় দিয়ে গেছি। বিতর্কে নামতে প্রস্তুত ছিলাম না। মণি ফোন ছেড়ে দিলে শীলার মুখের তীর্যক ভঙ্গীটুকু বার বার উঁকি দিতে থাকল। কৌশলে সে চেয়েছিল আমাকে আমার গল্পের ভিতর ডুবিয়ে দিতে। আমি খুব সুচতুর যুবকের মত বারে বারে বুনো এবং ওর মা সম্পর্কে গল্পের অবতারণা করে নিষ্কৃতি পেতে চেয়েছি। বোধহয় এই পিকনিকে শীলা আবার সেই বিতর্কের জালে আমাকে ফেলার ফন্দি আটছে। শীলার ভিতরের দুষ্টবুদ্ধিটুকু ধরতে পেরে আমি কেমন বিমর্ষ বোধ করতে থাকলাম।

শনিবারের সন্ধ্যায় চা দিলে নিয়তিকে বললাম, খুব ভোরে কাল মণিদের সঙ্গে পিকনিকে যাচ্ছি। ওরা বলছে ডায়মণ্ডহারবারের দিকে যাবে। শুভেন্দুকে তুমি চেন। শুভেন্দু আমার পরিচিত, তোমারও। সে যাচ্ছে ওদের বড় গাড়ি নিয়ে। আমরা সারাদিন থাকব। ফিরতে ফিরতে রাত হতে পারে।

আমি ইচ্ছা করেই বললাম না, রাত পোহাতেও পারে। মণি পরদিন ফোনে বলছিল সেখানে বড় একটা টুরিষ্ট হাউস আছে। দরকার পড়লে রাত কাটিয়ে আসব। সেখানে গেলে বেশ কিছু মনোরম দৃশ্য চোখে পড়বে, সামনে নদী, বড় প্রশস্থ নদী, মোহনার কাছে এই নদীর ওপার প্রায় অদৃশ্য গোছের—কিছু সমুদ্রের পাখি পর্যন্ত কোন কোন সময় শীতের তাড়নায় ভিতরে চলে আসে।

ভেবেছিলাম নিয়তি বলবে, যখন যাচ্ছ যাও। আমাদের নিয়ে গেলেও পারতে। এক দিনের ব্যাপার, বেশ হৈ চৈ করে ফেরা

যেত। সে তা না বলে বলল, গরম জামা কাপড় নিয়ে যাবে। কি কি নেব তার একটা হিসাব চাইল নিয়তি, সে রাতেই সব বের করে রাখবে। বিশেষ করে নিয়তিকে প্রফুল্লই দেখাল। অনেকদিন পর একটু বাইরে যাচ্ছি, সারাদিন কাজ আর কফিহাউস অথবা রাত জেগে লেখা এবং ভোর রাতে যখন নিয়তি কোন কাবণে জেগে যায় তখন দেখতে পায় আমি আমার টেবিলে বসে আছি, আমার অত্যধিক পরিশ্রমের কথা ভেবে নিয়তিকে মাঝে মাঝে বড় উদ্বিগ্ন দেখায় সুতরাং এই সামান্য আউটিং নিয়তিকে প্রায় হাসি খুশী বালিকার মত প্রফুল্ল করে রাখছে।

নিয়তি বলল, ঠাণ্ডা লাগাবে না।

পাগল ঠাণ্ডা লাগাই!

সময় মত খাবে।

পেটের ট্রাবল আছে। এবার নিয়তি নিশ্চয়ই বলবে, বেশী মশলা দিতে বারণ করবে। মাঝে মাঝে নিয়তিকে বড় অবুঝ মনে হয়। যাচ্ছি পিকনিকে, এক দিনের ব্যাপাব—আমার শরীর সম্পর্কে যেন ওর চিন্তার অবধি নেই। কি খাব, কি ভাবে থাকব, কড়া রোদে যেন শীতের মাঠে খোলা চোখে বেশী সময় বসে না থাকি, সান গগলস্ যেন হারিয়ে না ফেলি এবং সময়ে যে সামান্য মদ্যপান করে থাকি উৎসাহে- -তা যেন না হয়—এমন সব অনেক শলা পরামর্শ করল। আমি যেন সত্যি দীর্ঘদিনের জন্য প্রবাসে যাচ্ছি। নিয়তির এই সব বাড়াবাড়ি মাঝে মাঝে আমার ভয়ঙ্কর বিরক্তিকর মনে হয়। আমার মনে হয় এই নিয়তি যে চপল এবং চঞ্চল যার স্বভাব বালিকা সুলভ এবং যে আমার ভালো মন্দের জন্য সব সময় বড় বেশী উদ্বিগ্ন—যেন আমি এক মানুষ তার, আউল বাউলের মত মানুষ—তারে যায় না জলে ফেলা, তারে, যায় না ঘরে রাখা, হায় কেবল হারিয়ে যাবার ভয়—নিয়তির ব্যবহারে সব সময়ই এমন একটা ভাব থাকে। আমি বললাম, তুমি অত ভাববে না তো।

লোকে বিয়ের পর কত জায়গায় রোমান্স করতে যায়। তোমার রোমান্স ভিক্টরিয়া, দক্ষিণেশ্বর খুব দূরে গেলে চিড়িয়াখানা। নিজে কোথাও যাওনা। যেতে চাওনা, আমি যেতে গেলে শতেক বাধা।

অত বোকা হলে রোমান্স হয় না। বলে নিয়তি ফিক করে হেসে দিল।

তুমি আমাকে বোকা বললে নিয়তি!

নয়ত কি। বিয়ের পর পরই বলে চোখে ইশারা করে বুনোকে দেখাল।

অঃ। আমি হতাশ গলায় কথাটা বলে বসে থাকলাম। বুনো হবার পর আমরা চালাক হয়ে গেছি। নিয়তি আমার বন্ধু প্রভাতের কথা এসব প্রসঙ্গে টেনে আনে। প্রভাত কেমন চালাক চতুর। বৌকে নিয়ে হিল্লি দিল্লী করে বেড়ায়। অর্থাৎ আমার এই যে নিয়তি যার বয়স এখন পঁচিশ, যে একটি সন্তানের জননী, যে এখন স্বামী এবং সন্তান সর্বস্ব হয়ে আছে তার মুখের দিকে তাকালে মনেই হয়না আমাদের এই উভয়ের বোকামি ওকে কোন কারণে জীবন সম্পর্কে অত্যুৎসাহ করে রেখেছে। বরং এই বোকামিটুকুর জন্য সে আমাকে আরো বেশী ভালবেসে ফেলেছে। আমি ক্রমশ ঘরমুখী হয়ে গেছি।

নিয়তিকে বললাম, তোমার এভাবে ভালো লাগে!

কি ভালো লাগে!

এই যে সারাদিন ঘরের ভিতর কাজ আর কাজ।

নিয়তির যেমন স্বভাব, সে কিছুতেই এসব কথার উত্তর দেবে না, এমন মিষ্টি করে হাসবে যে দেখলে মনেই হবে না যুবতী, আমার এই ভালবাসার যুবতীর জীবনে আর কোন ইচ্ছা আকাঙ্খা আছে। আমার এই যুবতী আমাকে চারপাশে ঘিরে রেখেছে। অথচ জীবন যাপনে মধুর সব স্মৃতি, এই যে চলাফেরা পথে ঘাটে, কত কিছু দেখা, যুবতীদের দেখতে দেখতে ঘরের যুবতীর কথা যখন মনে থাকে

না, যখন মাঠ ঘাট ফেলে কোন পর্বতারোহণের জন্য পাশে অন্য এক যুবতীর মুখ দেখি তখন এই যুবতী নিয়তি, নিয়তি আমার যুবতী, আমার একান্ত অনুগত, তার ভালোবাসার জন বলতে আমি, কাক পক্ষিটি পর্যন্ত টের পায় যেন আমি বাদে তার আর কেউ নেই, তখন চোখে মুখে আমি অন্ধকার দেখি। নিয়তি পাশে দাঁড়ালে বলি, তোমার ইচ্ছা হয় না বড় নদী দেখতে ?

নিয়তি আমার এই পাগলামিটুকু তার সরল অকপট ব্যবহারে মুছে দিতে চায়। বলে, তুমি কি সব আজে বাজে বকছ।

নদীর একপারে একা একটা মানুষ নিয়ে চিরদিন ভাল লাগে বসে থাকতে ?

এখনও অত সব ভেবে দেখিনি। বুনো বড় হোক তারপর ভেবে দেখা যাবে। দ্রুত এক জলতরঙ্গের মত হাসির শব্দ শুনি। যেন নিয়তি বলতে বলতে চলে যায়— লেখক মানুষদের নিয়ে ঘর করা বড় দায়। ওরা নিজের বৌকে পর্যন্ত গল্পের নায়িকা করে রাখতে ভালবাসে।

অগত্যা পরদিন অমাকে রওনা হতে হল। খুব ভোরে নিয়তিই আমাকে ডেকে দিয়েছে। গরম জল করে দিয়েছে মুখ ধোবার জন্য। পেষ্ট এবং তোয়ালে সব হাতের কাছে এনে দিয়েছে। দাঁত মাজার ফাঁকে নিয়তির মুখ দেখলাম। ঘুমকাতুরে মেয়েটির চোখে এখনও ঘুম লেগে আছে। আমি বের হয়ে পড়লেই ফের হাত পা ছড়িয়ে ঘুম যাবে। রোববারে এমনিতে দেরী করে ওঠার অভ্যাস, আমি থাকব না, ছুজনের মত আহার প্রায় কোন রকমে অরন্ধনেই দিন কাটিয়ে দেবার ওর ইচ্ছা যাবে। সুতরাং নিয়তি কোন রকম আমাকে বাড়ির বার করে দিতে পারলেই যেন বাঁচে।

দরজার মুখে আমার বুনোর কথা মনে পড়ল। বুনোকে চুমু খেলাম কপালে। দরজা পার হতে নিয়তি আগলে দাঁড়াল, নিয়তিকে কিছু দিতে হয়, যাবার মুখে সামান্য খুনসুটি। ছু বাহুতে ওকে

টেনে কাছে নিতেই সেই ছুষ্টু হাসিটুকু মুখে, ছাড়। কি হচ্ছে যাবার সময়।

এ সব ব্যাপারে ওর ইচ্ছা অনিচ্ছার দাম আমার কাছে কানা-কড়ি। নিয়তি নিজের ভিতর কেমন এক ঠাণ্ডা ভাব সব সময় লুকিয়ে রাখে। যেন মেয়ে কিছু বোঝে না, জানে না। তুমি তারে উলঙ্গ করে নাও। যা কিছু প্রয়োজনীয় তুমি উশুল করে নাও, কোনদিন নিয়তিকে ছুটে আসতে দেখিনি, বড় লাজুক মেয়ে, চোখ বুজে, যেন চুরি করে জমির ধান গোলায় তোলা হচ্ছে; মাঝে মাঝে এত বিরক্তির ব্যাপার -যে ধুত্তোরি ছাই বলে ওকে ঠেলে ফেলে দিয়ে উঠে পড়ি। নিয়তি তখন হা হা করে হাসতে থাকে। কোথায় যেন সে আমাকে রাগিয়ে দিয়ে আনন্দ পায়। যাবার আগে নিয়তিকে জোড় করে টেনে নিলাম বিছানাতে। সে তখন উৎসর্গকৃত হয়ে পড়ে থাকল।

গাড়িতে উঠে বসলে গোটা ব্যাপারটাই হাস্যকর মনে হল। ভোর হয়নি ভাল করে। জল দিচ্ছে রাস্তায়, আমাদের গাড়িতে এখন আমি এবং ড্রাইভার। প্রথমেই আমাকে তোলা হয়েছে। তুলতে তুলতে আমরা বালীগঞ্জ এবং আলিপুর হয়ে ডায়মণ্ডহারবার রোডে পড়ব। নিয়তির কাছে ক্রমশ আমি এবং বুনো প্রায় এক পর্যায়ে এসে গেছি। ক্ষিধে পেলে খাও বাপু, বসে বসে খেতে দিতে যখন পারি না, খিদে পেলে খেয়ে নিও। নিয়তির শরীরে তোলপাড় করার ব্যাপারটা একেবারেই নেই। কেমন নিষ্প্রভ, কেমন মৃত এবং কেমন ভালমানুষের ঝির মত নিয়তি। এত বয়সেও যেন তার লজ্জা ভাঙ্গল না। মনে মনে নিয়তিকে এই সকালে, যখন ট্রাম বাস চলতে শুরু করেছে, যখন এক তুই করে মণি উঠে এল, শুভেন্দু উঠে এল সব হাসি পরিহাসের ভিতরও নিয়তিকে মনে মনে ক্ষোভের কথা না জানিয়ে পারলাম না।

কিরে মুখ গোমরা করে বসে আছিস কেন? মণি প্রায় ঠেলা দিয়ে আমাকে যেন জাগিয়ে দিতে চাইল।

কৈ মুখ গোমড়া করে বসে আছি?

দেখলে ত মনে হয় বৌর সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছিস।

তোর ত কেবল এক কথাই মনে হয়। বিয়ে করলেই বুঝি বৌ কেবল ঝগড়া করে!

তাই ত শুনি।

বিয়ে না করে এত শুনলে চলবে কেন! বলে আমি শীলার দিকে তাকালাম। বললাম, আপনি কি বলেন!

কি আর বলব বলুন। এবার একটা ব্যবস্থা করে ফেলুন।

শুভেন্দু বলল, নারে ভাল আছিস। বিয়ে করা মানে প্রায় গলায় কলসী বাঁধার সামিল।

আমাদের গাড়িটা এসে ঝকঝকে একটা লনের কাছে বিরাট বাড়ির গেটে দাঁড়াল। এখান থেকে উঠল বড় দুটো গামলা, থালা খুন্তি এবং চারটা মুরগী, গাড়িটা প্রায় স্টেশন ওয়াগানের মত। পিছনের দিকে বেশ জায়গা আছে। আমাকে নিয়ে চারজন, মনে হল আরও দু একজন উঠবে। আর যখন মুরগী উঠল চারটা, টমেটো উঠল এক ঝুড়ি আর কি উঠল, বুঝি দুটো বড় বাঁধা কপি, আলু এবং যত কিছু দরকার ভোজের জন্য সবই প্রস্তুত। শেষে যিনি এলেন, উচু লম্বা এক যুবতী। প্রায় আমার সমান উঁচু হবে, এত বড় বাড়িটাতে তিনি একা থাকেন ভাবতেই শরীরে কেমন বিদ্যুৎ খেলে গেল। কালো চশমার ভিতর ওর চোখ কত বড় আন্দাজ করতে পারছিলাম না। কালো চশমার ভিতর যুবতীদের চোখ আমার কাছে নদীর ওপারের বাতি ঘরের মত—যেন কেবল টানে, যেন যুবতী ইচ্ছা করে কিছু লুকিয়ে রেখেছে। আমি চোখ তুলেও নামিয়ে আনলাম। মণি আমার অসহায় অবস্থাটা বুঝতে পেরেই বলে উঠল এই আমাদের সরল, নিশ্চয় নাম শুনেছেন, আর ইনি আমাদের কেতকী নাগ, কিছু-

দিন হল কন্টিনেণ্ট থেকে ফিরেছেন, চলনে বলনে একেবারে হাল আমলের যুবতী, তোমাকে ইচ্ছা করলে কালকে ফরাসীদেশে নতুন কি বই রিলিজ হয়েছে বলে দিতে পারে।

আমি বললাম, অ! মুখটা কিছুক্ষণ ইচ্ছা করেই হা করে রাখলাম। আমি সকলের চেয়ে লম্বা, যুবতী প্রায় আমার মাথার কাছে উঠে যাচ্ছে। সোজা হয়ে বসে আমি যে যুবতীর চেয়ে বেশী লম্বা তা সকলকে বুঝতে দেবার জন্য মেরুদণ্ড সটান করে সন্ন্যাসী হয়ে গেলাম।

কেতকী শীলার মামাতো বোন। সে শীলার পাশেই বসল। গাড়ির ভিতর আমরা পাঁচজন এখন মুখোমুখি বসে।

আর কে যাবেন।

শীলা বলল, আমার এক বান্ধবী যাবেন। তাকে আমরা বরিষা থেকে তুলে নেব।

তবে আমরা কতজন হলাম? মনি প্রশ্নটা করল।

মোট ছ'জন।

আর কেউ যাবে না?

উড়ে ঠাকুর নিতাই বাসে যাবে।

কতক্ষণ লাগবে আমাদের যেতে!

প্রায় দু ঘণ্টার মত।

মনে হল শীলা সুভেন্দু তারা প্রতি বছরই এ সময় ডায়মণ্ড-হারবারে পিকনিকে যায়। ওরা ডায়মণ্ডহারবার এবং তার নদী তীর, বাজার হাট সম্পর্কে এখন থেকেই নানা ভাবে গল্প আরম্ভ করে দিল। এমন কি সেই টুরিষ্ট লজ সাগরিকার গল্প। এক বৃদ্ধের গল্প আর কোন এক যুবতী এসেছিল যে চোখে দূরবীণ নিয়ে সব সময় বসে থাকত। কথায় কথায় জানলাম সেই মেয়ে এখন শীলার বান্ধবী তাকে আমরা বরিষা থেকে তুলে নেব।

বলার ইচ্ছা হল, দূরবীণটা কি তিনি এবারেও সঙ্গে নেবেন?

কারণ দূরবীণের গল্প বললে আমার সেই সমুদ্রজীবনের গল্প মনে আসে। সাদা জাহাজের ছবি ভাসতে থাকে। এবং মাঝে মাঝে যখন কিছু ভাল লাগে না, যখন সহরের এক ঘেয়ে জীবন, ফাইল, দলিল দস্তাবেজের ভিতর ডুবে থাকি তখন সেই সাদা জাহাজ আমার জীবনে ছবির মত প্রাণের সঞ্চার করে। আমি বললাম, যুবতীর দূরবীণ কোন রঙের ?

শীলা বলল, লাল রঙের।

আমাদের জাহাজে মেজমালোমের একটা দূরবীণ ছিল, রঙটা ছিল কালো রঙ।

সঙ্গে সঙ্গে সকলেই চাঙ্গা হয়ে বসল। মণির যা স্বভাব সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, ওর ত আসল পরিচয়টাই দেওয়া হয়নি। আমাদের সরল জাহাজে জাহাজে অনেক দেশ ঘুরেছে।

কেতকী বলল, আপনি-- বাল্টিমোরে গেছেন ?

বললাম, না।

ভিয়েনাতে ?

না।

কোথায় ভিয়েনা, কোথায় বাল্টিমোর ! আমার বলার ইচ্ছা হল, আপনি ব্লাডিভষ্টকে গেছেন, উটাকামণ্ডে ? কেতকী একবার তার কালো চশমাটা খুলে রুমালে কাঁচটা মোছার সময় বোধহয় আমাকে ভাল করে দেখল। অথবা এও হতে পারে আমাকে ভাল করে দেখার জন্যই চশমাটা চোখ থেকে খুলে বেশ সময় নিয়ে কাঁচটা মুছে বলল, আপনি তা হলে নেভিতে কাজ করতেন ?

মার্চেণ্ট নেভিতে।

যাত্রী জাহাজে কাজ ছিল।

না। মালের জাহাজে।

কোন্ কোন্ রুটে আপনাদের জাহাজ চলত ! আমি একবার বুঝলেন ফ্যান্সী টুরে ফ্রান্সের দক্ষিণ অঞ্চলের সহর লা মারে থেকে

লুইজনে গিয়েছিলাম। খুব ছোট সহর। পাহাড় এবং হ্রদের চারপাশে কি বড় বড় সব ওক জাতীয় গাছ। সরাইখানায় জায়গা পাওনা গেল না। সারারাত শীতের ভিতর জাহাজঘাটায় কাটিয়ে দিলাম।

আপনি খুব সাহসী দেখছি। মণি টিপ্পনি কাটল।

শুভেন্দু বলল, বাঙ্গালী মেয়েরা বাইরে গেলে এত বেশী চালাক চতুর যে মনেই হয় না দেশে এই মেয়ে ডাল চচ্চরী দিয়ে ভাত খেয়েছে। আমি একটা মেয়েকে জানি, বুঝলেন, বলে সে বলল, তুমি কিন্তু রাগ করো না শীলা। সে শীলার দিকে তাকাল। বলল, এখান থেকে প্যাসেজ মানি এবং জব কার্ড যোগাড় করে একেবারে আমার ঠিকানায় এক মেয়ে উপস্থিত। আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের চিঠি তার হাতে। রাত্রিবেলা ঘরে ফিরে দেখি দরজায় বাঙ্গালী মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ব্রিমিংহামের ইণ্ডিয়ানদের পাড়ায় তখন মাত্র একটা ঘর কোনরকমে যোগাড় করেছি। ঘরটা এত ছোট যে আমার মাথা এবং পা দু'দেয়ালে ঠেকে যেত। বলে সে কেন জানি ফের শীলার দিকে তাকাল। শীলাকে নিশ্চয়ই গল্পটা বলেছে, অথবা এমন হতে পারে যে সে শীলার দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করল এমন একটা রসের গল্পে শীলা রুষ্ট হবে কিনা। শুভেন্দু শীলার মুখে যাই পড়ে থাকুক আমরা সমস্বরে বলে ফেললাম, আতুড়ে নিয়ম নাস্তি। ভ্রমণের নিশান ওড়াও। তোমার গল্পটা শুনব আমরা শুভেন্দু। শীলা তুমি বাধ সাধবে না। মণি শীলাকে প্রায় ধমকের সুরেই কথাটা বলল।

আমি আবার বাধ সাধতে যাব কেন।

মণি বলল, তাছাড়া আমরা যখন কেউ সাধু পুরুষ নই।

শীলা মুখ গম্ভীর করে বলল, সে ত আমার জানতে বাকি নেই।

এদের ভিতরে আমি প্রায় আগন্তুকের সামিল। আমি কোন কথাই জোর দিয়ে বলতে পারছি না। শীলা আমার দিকে তাকিয়ে

তার হয়ে কিছু বলি এমন একটা ভাব-প্রকাশ করতে চাইল। কি বলা যায়। মণি সব রকমের কথা বলতে পারে। খুব জোরে হেসে তা উড়িয়েও দিতে পারে। কোন কথায় কতটা গুরুত্ব আছে, কি বললে তার কি মানে দাঁড়াবে বলার আগে মণি একবারও ভেবে দেখে না। বলার পর পরিবেশটা থমথমে হয়ে গেলে সে সহজেই তা সামলে দিতে পারে। এমন সরল সহজ ভাবের মানুষ মণি ফের বলল, তারপর শুভেন্দু।

তারপর আর কি! আমি বললাম, আমি শুভেন্দু বোস।

মেয়েটি বলল, আমি কণা মিত্র। এই বিদেশ বিভুঁয়ে আপনিই আমার একমাত্র পরিচিত, আমি এখানে থাকব।

প্রায় মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ার মত, ছোট ঘর। ঘরটার ভিতরে ঢুকিয়ে দেখালাম, বললাম, এই আমার ঘর, গরীবের মহাফেজখানা।

মেয়েটি বলল, হু'এক রাত। কোনরকমে কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

এবার শুভেন্দু শীলার দিকে তাকাল। তারপর আমার দিকে। বলল, বুঝলেন সরলবাবু, একেবারে যুবকের মত ব্যবহার। সে নিজেই বলল শীতের দেশ। পাশাপাশি দুজনে দুরাত কাটিয়ে দিতে কষ্ট হবে না। শুভেন্দু আরও কিছু বলতে চাইলে, মণি এবারেও ধমক দিল, থাক হয়েছে। এখানে থামলেই চলবে। পরেরটুকু আমরা বুঝে নিতে পারি।

কেতকী বলল, তাতে দোষের কি আছে। বলে সে তার সিগারেটের প্যাকেট বের করে সকলকে একটা একটা করে দেবার জন্য হাত বাড়ালে, বললাম, এত কড়া আমার চলবে না।

খুব একটা কড়া হবে না। খেয়ে দেখুন না।

গাড়িটা চলছে। আমরা ইনফরমেশন সেন্টার ডাইনে ফেলে মাঠ অতিক্রম করছি। শীতের ঠাণ্ডা আমাদের বেশ ভালো লাগছিল। গাড়ির ভেতরে কেউ এখন কথা বলছে না। সকলেই এখন শীতের

মাঠ দেখছে। সূর্য ওঠেনি। কিছু পাখি এসে শীতের মাঠে বসেছে। আমাদের গাড়ি খুব ধীরে ধীরে চলছিল। আমাদের ভিতর কোন ব্যাস্ততা ছিল না। শীলা এক সময় বলল, আপনাদের চা তেষ্টা পেলে বলবেন। বোধ হয় শীলা নিজে ইচ্ছা করেই থমথমে ভাবটাকে এইটুকু বলে হাল্কা করে দিতে চাইল।

গাড়ির ভিতর হু হু করে বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকছে। শীতের সময়ে কুয়াশা লেগে থাকার কথা, কিন্তু সহরের কোথাও কুয়াশা দেখতে পেলাম না। সূর্য উঠল। আমরা মাঠ পার হতে হতেই সূর্য উঠে গেল বোধ হয়। কারণ গাছের ফাঁকে, অথবা রেসকোর্সের রেলিঙে আমরা সূর্যের আলো পড়েছে দেখতে পেলাম। হি হি করে উত্তরের বাতাস। এতক্ষণে মনে হল গাড়িটার ভিতর শীত বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। মণি বলল, বড্ড শীত লাগছে! শীলা তুমি এবার গান গাও।

শুভেন্দু বলল, শীলা বেশ চলতি একটা গান ধরে ফেল। যেন আমরাও গলা মেলাতে পারি।

শীলা বলল, বল কোন গান গাইলে তোমাদের সুবিধে হবে।

এই গানের কথায় আসায় গাড়ির ভিতরে সকলের মুখেই যেন স্বস্তি ফিরে এল। সকলে বিশেষ করে শীলা গান সম্পর্কে উৎসাহ দেখাল খুব। শীলা নিজে গান গায়, বেতারে ওর কণ্ঠ আমার শোনা। এসব জায়গায় সামান্য সাধাসাধির ব্যাপার থাকে। বার বার না অনুরোধ করলে গায়ীকাদের গলা খুলতে চায় না কিন্তু শীলার এই উদারতাটুকু দেখে আমরা শীলাকে কেন জানি সেই আগের শীলা— অর্থাৎ যে শীলা আমাকে বিতর্কে নামিয়ে মজা দেখতে চেয়েছিল সেই শীলাকে ভুলে গেলাম। শীলার প্রতি আমার সব ব্যাপারেই সমর্থন করার ইচ্ছা ভিতরে ভিতরে গজিয়ে উঠছে। এই গান বোধহয় কেতকীর অপ্রিতীকর। ওর মুখের রেখাতে কোন ভাঁজ পড়ছিল না। আনমনা হয়ে সিগারেট টানছে। কেতকীকে আমি একবার চোখের

কোণে দেখলাম। দেখতে গিয়ে ভুলই করলাম বোধহয়। কারণ কালো চশমার ভিতর কেতকী কাকে দেখছে বোঝা যাচ্ছে না। যদি আমার দিকে তাকিয়ে থাকে তবে চোখের কোণে তাকানোটা দুর্বলতার লক্ষণ। সে ধরে ফেলে হয়ত মনে মনে হাসছে। এবার জোর সমর্থনের গলায় বললাম, শীলা আপনি যে কোন গান ধরে দিতে পারেন। দেখুন আমরা কেমন তাল দিচ্ছি।

মণি বলল, সরল তুই আবার তাল দিতে শিখলি কবে। তোর মত বেসুরো মানুষ বাংলা দেশে কটা আছে বলতে পারিস।

বস্তুতঃ আমি গান জানি না, কোন গানের কলি আমার মনে থাকে না। সুতরাং বলতে হল, তোরা গা, আমরা শুনি। সকলে গাইলে তাল দিলে চলবে কেন।

আমরা বলতে আমি আমার দলে কেতকীকে রাখতে চাইলাম। কিন্তু মনে হল কেতকীর এ ব্যাপারে এতটুকু সায় নেই। যেন বলার ইচ্ছা, ও গাইলে আমিও গাইতে পারি। ওর গানে গলা মেলানো যাবে, আমার গানে গলা মেলানো যায় না। আমার গান শুধু একার। একা গাইবার।

আমরা এতক্ষণে বরিষা অঞ্চলে এসে গেছি। কিছু সরু গলি পার হলে বিস্তৃর্ণ জায়গা। নতুন বাড়ি। বড় বাগান সামনে। ফুল ফলের গাছ, লতাপাতায় সব দেশ বিদেশী ফুল ফুটে আছে। গাড়ির হর্ণ বাজাতেই ভিতরের দরজা খুলে গেল। আমরা আমাদের গান সম্পর্কে কথাবার্তা এখন বলছি না। সকলেই বাড়িটা উঁকি দিয়ে দেখছি। শীলা লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। সে নুড়ি পাথর ছড়ানো রাস্তার ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। আমরা চুপ চাপ বসে শীলাকে দেখছি। কেতকী আবার চশমা খুলে ফেলেছে। সে রুমালে আবার কাঁচটা ঘসে ঘসে মুছল। তারপর চশমাটা নাকের ডগায় তুলে দেবার আগে বলল, আচ্ছা এত সব যে ফুল দেখছেন, সব ফুলের নাম করতে পারেন?

চশমার ভিতরে এখন চোখ। প্রশ্নটা আমাকে না মণিকে বোঝা যাচ্ছে না। আমি মণির দিকে তাকাতেই কেতকী বলল, আপনাকে বলছি ?

আমাকে ? অঃ। আমি কিন্তু কোন ফুলের নামই বলতে পারব না। কারণ এসব ফুল আমার চেনার কথা নয়। দেশী ফুল হলে সব ফুলের নাম বলে দিতে পারতাম।

মণি বলল, তুমি এত বিদেশ ঘুরলে ?

বিদেশ নয়। বল বন্দর। সেখানে কি ফুল ফুটে থাকে আমাদের জানার কথা নয়। একটা ফুল শুধু আমরা চিনতাম। সে ফুল পেলে, কি নাম ফুলের, কি জাত, বনের কি বাগানের ফুল জানার কোন উৎসাহ থাকত না। ফুলটা যতই কদর্য হোক তোমাদের কাছে আমাদের কাছে, আমাদের বলতে নাবিকদের কথা বলছি -স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়।

তা হলে তোমরা ফুল চেটে চেটে খেতে।

তা বলতে পার।

কেতকী বলল, আমি কিন্তু সব ফুলগুলির নাম বলে দিতে পারি।

শুভেন্দু বলল, আমিও বোধহয় পারব।

চলুন তবে দেখা যাক। বলে কেতকী লাফ দিয়ে নেমে যেতে চাইলে আমরা দেখলাম দরজার ভিতর থেকে এক কোমলমতি প্রায় কিশোরী বলা চলে, বালিকা বলা চলে—না, কাছে এলে দেখা গেল বালিকা অথবা কিশোরী নয়, যুবতী। যুবতী লম্বা গাউনের মত কায়দা করে শাড়ীটা পড়েছে, প্রায় যেন নিখুঁত হাতের ভাঁজে গোটা শাড়ীটা কোন লর্ড পরিবারের সুন্দরী যুবতীর লম্বা গাউন—কারণ শাড়ীর রঙ এবং ব্লাউজের রঙ একই, কোমল সোণালী রঙের পোষাক, শীতের রোদে ঝলমল করছে।

বোধহয় আমরা সকলেই ওর ঝলমলে পোষাকের দিকে

তাকিয়েছিলাম। এ সময় কেতকী আমাদের অন্যমনস্ক করার জন্য বলল, বাড়িটা বেশ নিরিবিলি জায়গায়।

শুভেন্দু বলল, এমন ঘিঞ্জি গলি পার হলে এমন একটা ছবির মত বাড়ি পাওয়া যাবে বোঝাই যায় না।

এখন আর নামার সময় নেই বলে কেতকী গাড়ি থেকে না নেমেই কিছু ফুলের নাম করে গেল। শীলার সঙ্গে যুবতী বাড়ি থেকে নেমে আসছে। ওর বাবা মা বারান্দায় দাঁড়িয়ে মেয়েকে বিদায় দিচ্ছে। কাঁধে বড় সাদা রঙের ব্যাগ। এত বড় ব্যাগ যে মনে হয় মেয়ে প্রবাসে যাচ্ছে। সাদা রঙের ব্যাগের ভিতর কি কি থাকতে পারে ভাবতে গেলে মনে হল সেই এক দূরবীণ, লাল রঙের দূরবীণ। এবারের পিকনিকে কি যুবতী তার সেই দূরবীণ সঙ্গে নিয়েছে! কি নিয়েছে, কি নেয়নি এই সব ভাববার সময় দেখলাম যুবতী গাড়িতে উঠে বসল। শীলা পরিচয়ের পালা সাঙ্গ করলে জানলাম যুবতীর নাম লীনা। বছর তিনেক আগে সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশনের সেকেণ্ড অফিসারের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। বরের বয়স ত্রিশের মত, যুবতীর বয়স বিশের মত। জাহাজ কলকতা বন্দরে আসার খবর থাকলেই—অর্থাৎ জাহাজ হোমে ফেরার কথা হলেই লীনা কাঁধে এই ব্যাগ নিয়ে ডায়মণ্ডহারবারে চলে আসে। তারপর জোয়ারের জন্য প্রতীক্ষা। জোয়ার এলেই সব জাহাজ সমুদ্র থেকে উঠে আসে। জোয়ারে জোয়ারে জাহাজ নদী অতিক্রম করে বন্দরে ভিড়ে যায়। কিন্তু হায় যুবতীর তর সয়না। খবর পেলে সে প্রায় উড়ে চলে যাবার মত যত দূরেই হোক চলে যেতে চায়। যুবতীর এবারে খবর আছে স্বামী তার সফর শেষ করে ফিরছে। শেষ চিঠি তার ফ্রিম্যাণ্টেল বন্দর থেকে। এজেণ্ট অফিস থেকে খবরে জেনেছে দু এক দিনের ভিতর জাহাজ এসে বন্দরে ভিড়বে। বন্দরে ভিড়লেই যুবতীর যা হবে - কি হবে—যা হবে না! আমার মনে এতসব কথা উঁকি মারছিল। আর গাড়ি চলতে থাকলে মনে হল লীনা

আমাদের চালাক মেয়ে—এমন রঙের শাড়ী পরেছে যার জন্য চুল মুখ শরীর লাবণ্যে ছেয়ে গেছে। কোন রঙে কোন ঋতুতে কোন শাড়ীতে শরীরের রঙ মনোরম হয় লীনার সব জানা। স্বামী ফিরছে সফর থেকে। দূরবীণের কাঁচে স্বামীকে জাহাজের ডেকে দেখার জন্য এমন একটা রোমাঞ্চকর যাত্রা। জাহাজ ভিড়তে ভিড়তে বাঁধা ছাদা হতে লীনা বন্দরের উদ্দেশ্যে ফের গাড়ি ছুটিয়ে দেবে। শীলা বোধহয় এসব এক নাগাড়েই বলে যেত—কিন্তু লীনা বাধা দিল, তুই শীলা বড্ড বকিস।

লীনাকে দেখলে মনে হয় সে কম কথা বলার মেয়ে। স্বামী প্রবাসে আছে চোখে তার চিহ্ন পুরোপুরি। কেমন বিষণ্ণ মাখা বড় বড় চোখ। সুখের পাখিটিকে ছেড়ে সখের পাখিটি এখন শুধু সমুদ্রে বিচরণ করছে। চোখ দেখলেই বোঝা যায় লীনা দু রাত হবে, বেশীও হতে পারে স্বপ্নের মত সেই মানুষের ভালবাসা বুকে নিয়ে জেগে রয়েছে। তার রাত আর কাটছে না। সে পাগলিনী প্রায় দূরবীণ নিয়ে এই পিকনিকের পার্টিতে মিশে ডায়মণ্ডহারবার যাচ্ছে। সারাদিন বন্দরে যত জাহাজ উঠে আসে দেখবে, সারারাত—যদি আমরা থাকি, যদি সে থাকে তবে রাতেও জেগে বসে থাকবে। প্রতিবারের মত টুরিষ্ট লজটার সামনে জাহাজ এলে স্বামী তার লাল নীল বাতি জ্বালবে। সে তখন বুঝে ফেলবে মানুষটা সফর শেষ করে যথার্থই ফিরছে। সে পাগলের মত তারপর ছুটবে, কেবল ছুটবে। ছোটার শেষ হবেনা যতক্ষণ না ফের মানুষটা সমুদ্রে নেমে যাবে। যাবার দিনেও লীনা শেষবারের মত গাড়ি করে ছুটে আসবে টুরিষ্ট লজটা পর্যন্ত। বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাত নাড়তে থাকবে, রুমাল উড়তে থাকবে।

তাহলে লীনা আপনাকে আপনি বলব না, তুমি বলব। সহসা কথাটা বলে নিজেরই কেমন লজ্জা লাগল। কেন বললাম, নিজেও তার কারণ খুঁজে পেলাম না। অকারণ তুমি বলা, বোধ হয় লীনার

শরীরে মুখে কোথাও এমন চপলতা আছে যা বালিকা সুলভ, যা মুধুর এবং প্রিয়।

শীলা বকবক করে এতসব বলে যাচ্ছিল যে লীনা লজ্জায় মাথা নীচু করে রেখেছে। লীনা স্বামীকে বড্ড ভালবাসে, ছেলে মানুষের ভালবাসাবাসি ওদের, বোধহয় এসব কারণে সে লজ্জায় ভাল করে আমাদের দিকে তাকাতে পারছিল না। সে আমার কথায় কেমন সামান্য প্রশ্রয় পেল। বলল, আপনি আমাকে তুমি বলবেন। আপনি আপনি করলে ঠিক জমে না! কি বলেন?

আমি কিছু বলব বলে মুখ বাড়িয়েছি লীনা তার প্রশ্রয়টুকুর ষোল আনা আদায় করার তালে এবারে অনুরোধ জানাল, দয়া করে শীলাকে এবার চুপ কারন তো। সে ত দেখছি আমাকে শ্রীরামের পত্নী সীতা না বানিয়ে ছাড়ছে না। যেভাবে শীলা রামায়ণ গাইছে।

শীলা বলল, বেশ আর গাইব না। কিন্তু বলে রাখছি বাপু আমরা সবে খাটব খুটব আর তুমি বারান্দার ডেক চেয়ারে বসে নদীবক্ষে (নদীবক্ষে কথাটা শীলা কটাক্ষ করে বলল) অশোক বনের সীতার মত দূরবীণ চোখে প্রতীক্ষায় বসে থাকবে—কোন জাহাজ উঠে গেল, কোন জাহাজ আবার উঠে আসতে পারে ভেবে কেবল পায়চারী করবে—তা চলবে না। জাহাজ উঠে এলে আমরা সবাই মিলে দূরবীণের কাঁচে তোমার মানুষটিকে খুঁজব।

সে খুঁজবে। আমি কি বারণ করেছি!

বস্তুত লীনার এই পিকনিক পার্টি এক ঢিলে দুই পাখী মারার মত। আজ হোক কাল হোক ওর সেই নির্দিষ্ট জাহাজ নদীতে উঠে আসবে। ফলতার মুখে এক জোয়ারের অপেক্ষা, তারপরই কলকাতা বন্দর।

আমি বললাম তুমি কি লীনা প্রতিবার এভাবে ডায়মণ্ডহারবার ছুটে যাও।

লীনা প্রথমে কোন উত্তর করল না। বোধহয় ওর ছেলেমানুষীর জন্য সে নিজেই লজ্জা পাচ্ছে। সে ধীরে ধীরে বলল, আসি। জানিনা কেন এমন হয়। ওকে কত শিঘ্ঘির দেখতে পাব সেই আশায় ছুটে আসি।

যতটা ছেলেমানুষ ভেবেছিলাম, লীনা ঠিক ততটা নয়। বড় আদর যত্নে লালিত, মিষ্টি ভালবাসার স্বপ্ন এখনও চোখে লেগে রয়েছে। আমি আর কোন প্রশ্ন করতে পারলাম না লীনাকে।

যেতে যেতে দুপাশে আমরা দুটো খামার বাড়ি দেখলাম। রাস্তার মোড়ে মোড়ে নেমপ্লেট। হাঁস মুরগীর শব্দ পেলাম এবার। বোঝা যায় দুপাশে এখন শুধু গ্রাম এবং ফসলের মাঠ। ইতস্তত বড় বড় কল কারখানা অনেকটা জায়গা জুড়ে বসে আছে। আবার গ্রাম এবং মাঠ। বেশ এঁকে বেঁকে রাস্তা। কখনও সোজা গাড়ি চলছে না। আমরা বেশ গাড়িতে দুলছিলাম।

শীলা এবার আপন মনে গান ধরে দিল। বোধহয় শীলা আর প্রতীক্ষা করতে পারছে না। বেশ জোরে গলা ছেড়ে শীলার গান—আমরা প্রথমে সকলেই গলা মেলাবার চেষ্টা করলাম। যা হয়ে থাকে, গান গাইবার ইচ্ছা থাকলেও গলা মেলানো যায় না, বার বার চেষ্টা, সব চেষ্টা বিফলে যাবার তবু চেষ্টা করে দেখা কিন্তু কিছুতেই গলা মেলানো গেল না। রাগে দুঃখে গলা মেলানোর চেষ্টা থেকে বিরত হলে দেখলাম কেতকী বেশ মুচকি হাসছে। ওর চোখ দেখা গেল না। কালো চশমার ভিতর ওর চোখ এ সময় আমার দেখার বাসনা হল। কালো চোখে সে আমার জন্য কতটা অবহেলা সঞ্চিত করে রেখেছে অথবা করুণা বলা যেতে পারে—সে সব লক্ষ্য করার তালে ছিলাম। কিন্তু হায় কিছুই দেখা গেল না। কারণ সে চশমা খুলে রুমালে কাঁচ মুছল না। বরং চশমাটাকে আরও ঠেলে ঠুলে নাকের ভিতর বসিয়ে রাখল।

রোদ উঠে গেছে। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম গাড়ি খুব দ্রুত

ছুটছে। আমাদের চুল উড়ছিল, লীনার শাড়ীর আঁচল বার বার খসে পড়ছে। শীলা খুব ভাল করে আঁচলটা কোমরে পেচিয়ে নিয়েছে। কেতকী ত আঁচল পড়ে গেলে খেয়ালই করছে না। বরং ভাল লাগছিল লীনাকে। লীনা ওর জামা কাপড় নিয়ে বিব্রত বোধ করছে। আঁচল বাব বার খসে বুকের কাছটা খালি করে দিচ্ছে ভেবে সে প্রায় সব সময় আঁচল সামলাতে ব্যস্ত। গানে গলা দিতে পারছে না।

মণির চোখে তন্ময়তা। যেন হায় উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল নিয়ে উতলা ধরণীতল। গাড়ি ছুটছে। সব উথাল পাথাল করে ছুটছে। এখন কথা বললেও কানের কাছে মুখ নিয়ে বলতে হয়। কেতকী দুবার জোরে জোরে উচ্চাবণ কবে শোনাল—কখন পৌছাতে পারব? আর এক রাউণ্ড চা। বেশ জমে উঠেছে আমাদের এই যাত্রা।

শুভেন্দু চা দিল সকলকে আর একবার। চকলেট এনেছে কেতকী। সে সকলকে দুটো করে চকলেট দিল। ও ইচ্ছা করেই হাত পাতলে আমাব হাতে চকলেট দেবার সময় যতটা স্পর্শ করাব দরকার তার চেয়ে বেশী যত্ন নিয়ে যেন আমার হাতটা ছুঁতে চাইল। কেতকীর হাত এত ঠাণ্ডা! না কি কেতকীই এই শীতে ঠাণ্ডা মেবে যাচ্ছে। আমি বললাম আপনার হাতটা বড় ঠাণ্ডা। নিন এবাব আমার সিগারেট আপনি খান।

কেন জানি ঠাণ্ডাটা আজ বেশী মনে হচ্ছে।

গাড়ি দুধারে যব গমের গাছ ফেলে ক্রমশঃ এগিয়ে যাচ্ছে। গ্রামাঞ্চল বলে হাঁস মুরগী খুব চোখে পড়ছিল। গরু বাছুর এবং গ্রামের সাধাবণ চাষা ভুষো লোক, গৃহস্থ লোক আর শুধু দুধারে মাঠ, গাছপালা, নাবকেল গাছই বেশী এবং কিছু পাখী—সাধারণতঃ গ্রামে গেলে যেমন মনে হয় সরল এক গ্রাম্য ছায়ায় চলেছি, আমাদের তেমনি মনে হতে লাগল।

এখন আমরা প্রায় সবাই দু পাশের গ্রাম মাঠ দেখছি। মোটরটা একবার খুব লাফিয়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে মনে হল পিছনে রাখা চারটা মুরগী একসঙ্গে কক্ কক্ করে উঠছে। মুরগীর ঝোল রান্না হবে। কেতকীর দিকে তাকিয়ে বললাম, এসব শীতের দিনে আস্ত মুরগীর রোষ্ট আর সামান্য বিয়ার হলে বেশ হয়। শরীরে শীত থাকে না।

কেতকী কি ভাবল বোঝা গেল না। ওর হাত ঠাণ্ডা, অন্ততঃ আমার হাতের চেয়ে ঠাণ্ডা। কেতকী নিবিষ্ট মনে সিগারেট টানতে টানতে বলল, আপনার লিকার চলে?

আপত্তি থাকার কথা নয়। তবে রপ্ত নই। এক সময়ে খুব খেতাম।

এখন আর খান না?

গেরস্থ মানুষ হয়ে গেছি।

তখন কি ছিলেন?

সেলর। সে জীবনে একটা উষ্ণতা ছিল। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সব উষ্ণতা কেমন কমে যাচ্ছে। গ্রাম মাঠের ছায়ায় ছায়ায় চলেছি বলে কিনা, অথবা এও হতে পারে অনেকদিন পর সহর ফেলে নিরিবিলি আমরা দুজনে চুপ চাপ যাচ্ছি—কেমন ভিতরের রসিক মানুষটি বার বার উঁকি দিতে চাইছে। ফলে কথায় বার্তায় আবেগের সুর ছিল—প্রায় আপন জনের মত ব্যবহার করতে ইচ্ছা হচ্ছিল।

শীলা আবার একটা গান ধরে দিল। কেতকী কি বলতে এসে ফের সোজা হয়ে বসল। ওর মনে হল বুঝি গানের ভিতর ওর গলার স্বর ডুবে যাবে। আমি শুনতে পাবনা। সে তাড়াতাড়ি সিগারেট বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাতটা কোটের পকেটে ঢুকিয়ে দিল।

ভোরের ঠাণ্ডা বোধহয় এবার লীনাকেও কাবু করেছে। সে তাড়াতাড়ি বড় ব্যাগ খুলে হলদে রঙের মোটা উলের কার্ডিগান

জড়িয়ে নিল শরীরে। ওর উজ্জ্বল সোনালী রঙের পোষাকের ষ্টাইলটা কেমন ম্যাড় ম্যাড়ে হয়ে গেল। ভিতরের সৌন্দর্য ঢাকা পড়লে যা হয়, হলদে রঙের কার্ডিগান লীনাকে সাধারণ বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত পরিবারের যুবতীদের মত করে দিল।

মণি বলল, এদিকে আমি আরও দুবার এসেছি।

শীলা গান থামিয়ে বলল, এই রাস্তাটা আমাদের বড় প্রিয়।

শুভেন্দু বলল, একবার আমাদের গাড়ি নীচে পড়ে গিয়েছিল। সে কি ঝামেলা! আমি আর শীলা গ্রাম থেকে লোক ডেকে এনে গাড়িটা তুলে যখন যাব যাব করছি, দুটো ছেলে বলল, স্যার আমাদের ডায়মণ্ডহারবার পৌঁছে দেবেন?

মণি বলল পৌঁছে দিয়েছিলে।

ধ্যাৎ। কে পৌঁছে দেয়।

তা হলে?

ওদের তুলে নিলাম। তারপর কিছুদূর গিয়ে হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে এটা ওটা টেনে বললাম বাছারা গাড়ি আর চলবে না।

মণি বলল, এটা কি ঠিক করলে?

ঠিক বেঠিক বাপু বুঝি না। তখন শীলা এবং আমার মাত্র বিয়ে হয়েছে। যাব রোমান্সে, সঙ্গে দুই উটকো লোক।

আমি বললাম, ওদের না নিলেই পারতেন?

তা হলে গাড়িতেই উঠতে পারতাম না। শুভেন্দু সে তার এক তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বলতেই চুপ মেরে গেলাম।

মণি এক সময় ড্রাইভারকে বলল অত জোরে চালাবে না!

অত জোরে কিরে! বলে শুভেন্দু হাসতে থাকল!

আমারও মনে হল গাড়ী খুব জোরে চলছে। রান্নার জন্য পাচক যাচ্ছে বাসে। আমি বললাম, পিকনিকে উড়ে ঠাকুরের রান্না জমবে না।

শীলা বলল, আমরাই করব। ফুট ফরমাসে সে থাকবে॥

তা হলে আমরা আছি কেন ?

ও, মশাইদের জানা আছে। বলে শীলা তিক্ত মুখ করে ফেলল।

কেন একথা বলছেন ?

বলব না ত কি ! প্রত্যেকবারেই এক কথা শুনি। তারপর আর বাবুদের পাত্তা পাওয়া যায় না। কেউ গাছতলায়, কেউ টুরিষ্ট লজের বারান্দায় অথবা কেউ মাঠ পার হয়ে দুর্গের মত জায়গাটায় একটা ঢিবির ওপর বসে থাকে। আপনাদের মশাই জানতে আর বাকি নেই।

আমি এবার শুভেন্দুর দিকে তাকালাম। বললাম, কি বলছে শুনছেন ?

ওদের কথা ধরতে নেই। বড় অবোধ ওরা।

কেতকী কেমন খোঁচা খেয়ে বলল, কি শুভেন্দুদার মুখে এসব কি শুনছি, বলে চশমাটা চোখ থেকে এবার যথার্থই খুলে ফেলল। কোলের উপর চশমাটা রেখে যেন সেই চশমা পরার জন্য নয়, কোলে রাখার জন্য এবং একবার আমার দিকে পর্যন্ত একটু তাচ্ছিল্যভরে তাকাল, তারপর ফ্লাস্ক খুলে সামান্য চা ঢেলে চুমুক দিতে দিতে বলল, কিরে শীলা তোকে শুভেন্দুদা এসব বলেছে আর তুই চুপ করে আছিস।

বলতে দে। বলে শীলা বাইরে ফের মুখ ঘুরিয়ে দিয়ে আপন মনে গানের কলি ভাঁজতে থাকল।

কেতকীর বোধহয় খোঁচাটা বেশী করে লেগেছে। যাকে উদ্দেশ্য করে বলা সে এখন সব ভুলে গ্রাম মাঠ ফসল অথবা ঝোপ জঙ্গলে স্বর্ণলতার লাবণ্য দেখছে আর কেতকী কথাটাকে নিয়ে প্রতিপক্ষের মত কবি গানের লড়াই শুরু করে দিল, যদি সবটা না জানতাম শুভেন্দুদা।

কি জানতে। শুভেন্দু হাসার চেষ্টা করল।

অবোধ কে ছিল তখন !

কে ছিল !

হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দিলে ভাল হয়।

বোধহয় কেতকী শুভেন্দুর বিবাহিত জীবনের আগে যখন শুভেন্দু শীলার সঙ্গে প্রেম করে বেড়াচ্ছে তখনকার কিছু ঘটনার বিস্তারিত বর্ণণা দিয়ে শুভেন্দুর উক্তিকে তাচ্ছিল্যভরে উড়িয়ে দিতে চায়। সে বলল, অবোধ বালিকাটির জন্য তখন ত আপনার রাত্রে ঘুম হত না। সারারাত জেগে কাটিয়ে দিতেন। এমন সুন্দরী, বুদ্ধিমতী বালিকা এমন সুগায়িকা, যেন এমন মেয়ে না হলে জীবনটা বিফলে যাবে, কত সব রঙ্গ দেখালেন তখন। আর এখন অবোধ বলে কেচ্ছা কাহিনী করা হচ্ছে।

কেতকীকে কে বলবে এই মেয়ে বিদেশ ঘুরেছে, কে বলবে এই মেয়ে সিগারেট খায়, সন্ধ্যার পর সামান্য লিকার না হলে চলে না ! প্রায় মা জ্যাঠিমার মত কোমর বেঁধে শুভেন্দুর সঙ্গে ঝগড়া করতে উদ্যত হল।

শুভেন্দু হার স্বীকার করার মত করে বলল, বেশ বাপু তোমরা অবোধ নও, সুবোধ। কি খুশী।

লীনা বলল, ফের যদি আমাদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেন তবে লঙ্কা কাণ্ড বাঁধিয়ে দেব। বলে সে কেতকীর দিকে সমর্থনের আশায় তাকাল।

আমি কেমন বিষণ্ণ বোধ করলাম। মণি বলল, এযে দেখছি সব জাহাবাজ মেয়ে নিয়ে আমরা রওনা হয়েছি। আমাকে কথা বলতে না দেখে মণি আবার বলল, কি রে চুপ মেরে যাচ্ছিস কেন। অবলা জীবদের জিভের ভয়ে।

শীলা বলল, সরলবাবু আপনার মত নয়। সে শুভেন্দুকে উদ্দেশ্য করে বলল, দেখ তুমি থেমেছ আর তোমার বন্ধুটি কেমন পিছনে লেগেছে।

শুভেন্দু মণিকে বলল, ভাই ওদের আর ঘাটাস না। ঘাটালে রসের আসরটা একেবারে ভেঙ্গে যাবে। রান্না বান্না করবে না, গোসা করে খেতে দেবে না, মান অভিমানের পালা চলবে।

আহা! মান অভিমান। কার ওপর আমাদের মান অভিমান। শীলা তীর্জক ভঙ্গীতে নিজের স্বামীটির দিকে তাকাল!

কেন—আমাদের ওপর মান অভিমান।

বয়ে গেছে।

কেতকী মজা দেখছিল। অথবা কেতকী এই নিয়ে বেশ রস করার জন্য বলল, আমাদের মজার বস্তুটি এমন যে মান অভিমান না করলে তার দাম বাড়ে না। আপনারাও চান একটু মান অভিমান চলুক তারপর সুখের পায়রাটাকে ধরতে পারলে প্রায় কাঁচা খাবার মত।

ভিতরে ভিতরে কেমন রহস্যবোধ করলাম কেতকীর কথায়। অথবা শিহরণ। কাঁচা খাবার কথাটা বোধহয় ভিতরে শিহরণ তুলছে। আমি এবার স্পষ্ট ভাবে কেতকীর দিকে তাকালাম। কেতকীর চোখ দেখব বলে, চোখের ভিতরে কি রহস্য ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং এই যে কাঁচা খাবার প্রসঙ্গে সে এল তার জন্য মনের ভিতরে কি রহস্য খেলা করে বেড়াচ্ছে জানার জন্য চোখের দিকে তাকালাম। কেতকী আমার অভিপ্রায় বুঝি ধরতে পেরেছে। সে মুহূর্ত আর দেরী করল না। চশমাটা দিয়ে চোখ ঢেকে ফেলল।

বাধ্য হয়ে অন্য কথায় এলাম। বললাম, জলের কি ব্যবস্থা করেছ মণি!

জল ওখানে পাওয়া যায়।

আমার মাঝে মাঝে এমন হয়। কথা খুঁজে পাই না। আমার ভিতরের অভিপ্রায়টা কেতকী ধরে ফেলেছে—আমি অসংলগ্ন কথা বলে কেতকীকে আরও সপ্রতিভ করে তুললাম। সে বোধহয় আর আমাকে গ্রাহ্য করবে না। অথবা আমাকে এড়িয়ে চলবে। আমি

এবার মনে মনে শপথ নিলাম—কেতকীর দিকে বেশী তাকাব না। ওর চোখ দেখব না। সে যেন ,আমার সব ইচ্ছার কথা জেনে ফেলেছে। জেনে ফেলে সে মনে মনে হাসছে।

কেতকীর দুই হাঁটুর ভাঁজে সিল্কের নরম সব সাদা লাল ফুল ফুটে আছে। সামান্য রোদ পড়ায় ভাঁজটা চক চক করছে। মুখের দিকে তাকাতে পারছি না, ভাঁজের দিকে তাকিয়ে আছি। বোধহয় অসভ্যতা ধরা পড়ে গেছে। কেতকী কাপড়টা টেনেটুনে ঠিক হয়ে বসল।

এভাবে মাঠ গ্রাম ফসল ফেলে আমরা ক্রমশঃ এগিয়ে যাচ্ছি। দ্রুত যাচ্ছি বলে গ্রামের নাম বাজারের নাম পড়া যাচ্ছে না। শীলা বলল, আমরা মাঠের পূবের দিকটাতে এবার তাঁবু ফেলব।

শুভেন্দু বলল, সকাল সকাল যাচ্ছি। দেখা যাক কি হয়।

মাঠের পূবের দিকটা একটু নিরিবিলি থাকে। বড় ঢিবিটা পার হলে নীচে ছোট একটা খালের মত, শীলা সেই খালের মত জায়গাটার পাড়ে তাঁবু পড়ুক এই চাইছিল।

ডায়মণ্ডহারবারের পিকনিক সম্পর্কে আমার কোন রকমের ধারণা নেই। বড় বড় ট্রাক যাচ্ছিল। আমরা ট্রাকগুলো পিছনে ফেলে ছুটছি। ট্রাকে মেয়ে পুরুষ ঠাসা, মাইক বাজছে, অথবা একদল লোক ট্রাকের মাঝখানে গোল হয়ে নাচছে। কোথাও কোন বাজারের কাছে ট্রাক থেমে আছে। ওরা সহর থেকে বাজার করে আনেনি, ট্রাক থামিয়ে বাজার করে নিচ্ছে। টেম্পো যাচ্ছে। ছুটির আমেজ এইসব মানুষদের ভিতর, ওরা ট্রাকের সঙ্গে হাত তুলে ছুটছে।

কেতকী যখন সচেতন ভাবে আমাকে পরিহাস করার চেষ্টা করছিল, শীলা যখন রান্নার ঝাল মসলা নিয়ে শুভেন্দুর সঙ্গে বচসা করছিল, এবং লীনা যখন আপন মনে বিভোর, তার স্বামী বিদেশ থেকে সফর সেরে ফিরছে, নদীতে অথবা নৌকায় তার স্বামীর

চেহারাটি চোখের ওপর ভাসছিল—সে বুঝি স্বপ্ন দেখছে আর আমাদের মণি নিশ্চিন্ত মনে সিগারেট টানছিল তখন কি আর করা যাবে আমি বাইরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। যতক্ষণ ডায়মণ্ড-হারবারে না পৌঁছাচ্ছি ততক্ষণ আর ভিতরের দিকে মুখ ফেরাব না।

কিন্তু কি হল, পিছন থেকে আমাকে কেতকী ছোট্ট করে স্পর্শ করে জানাল, এত কি দেখছেন।

কিছু দেখছি না।

ঘাড় ধরে যাবে।

কি করে টের পেলেন। মুখ আমার এখনও মাঠ এবং ফসলের দিকে।

ঘাড়টা শক্ত হয়ে যাচ্ছে।

আমার ঘাড় আমি টের পাচ্ছি না, আপনি টের পাচ্ছেন।

মনে ত হয়।

এবার দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে নিলেই দেখতে পেলাম, কেতকী চশমা খুলে ফেলেছে। যেন বলার ইচ্ছা, তুমি যত খুশী দেখো। আমার চোখের রহস্য তোমার চোখে যেমন খুশী ধরা পড়ুক।

বস্তুত কেতকীর এমন কথায় সামান্য প্রশ্রয় পেয়ে গেলাম। ভিতরে ভিতরে যে গ্লানিটুকু ছিল তা আর থাকল না, স্ত্রী নিয়তির কথা মনে পড়ল। ওর মুখ দেখতে পেলাম এবং মনের ভিতরে আমার মত নিয়তির অন্য ডালে বসার ইচ্ছা জাগে কিনা, যে নিয়তি সরল অকপট মানুষ, ওর বুনো বাদে, আমি বাদে অন্য কোন অস্তিত্ব আছে এসব নিয়ে ভাববার সময় মনি বলল, ওই যে দেখছেন ওটাই বড় অশ্বত্থ গাছ, ওটা পার হলেই আমরা ডায়মণ্ডহারবারের বাজারে ঢুকে যাব। মণি কেতকীকে উদ্দেশ্য করে বলল।

অশ্বত্থ গাছটা দেখার জন্য উঁকি দিতেই একটু ঝুঁকে পড়ল কেতকী। আমার পায়ের কাছে তার পা, হাঁটুর কাছে হাঁটু এবং প্রায় বুকের নীচে হাত রেখে সে অশ্বত্থ গাছ দেখছিল কি বড় নদী

দেখছিল বোঝা যাচ্ছিল না। আমি যতটা পারলাম কাঠ হয়ে বসে থাকলাম। লীনা হেলান দিয়ে চোখ বুজে আছে। ছুটির দিনে লীনার মুখে সরল অকপট ভালবাসার ছবি, এ ছবি কতক্ষণ জেগে থাকে কে জানে! ওর স্বামী নদীতে উঠে আসবে, সফর শেষে স্বামী ফিরছে, কতকাল আগে তার স্বামী তাকে ফেলে চলে গেছে, সমুদ্রে চলে গেছে, ওর দিন কাটছিল না, রাত আরও কাটছিল না, জানালার পাশে ওদের একটা গন্ধরাজের গাছ আছে, বোধহয় লীনা ফুল ফোটার স্বপ্নে রাত পার করে দেবার চেষ্টা করত, এখন সে তাও পারছে না। স্বামীকে দেখার জন্য অথবা নদীর মোহনাতে স্বামীর জাহাজে উঠে যাওয়ায় জন্য সে এখন পাগল। তাকে আমার প্রায় মৃত যুবতী বলে মনে হচ্ছিল। সে এমন কোন ব্যবহার করছে না যাতে আমরা প্রফুল্ল হতে পারি। চোখে বিষণ্ণভাব সব সময় সে ঝুলিয়ে রেখেছে।

মণি বোধহয় এসব সহ্য করতে পারছিল না। সে বলল, লীনা আপনি বুঝি ঘুমোচ্ছেন!

না। ঘুমোচ্ছি না। চোখ বুজে আছি।

চোখ বুজে পড়ে থাকলে চলবে কেন?

তবে কি করতে হবে?

জোরে জোরে গান গাইতে হবে। ছুটতে হবে। সারাক্ষণ একটা মানুষের কথা চিন্তা করবেন এটা কেমন কথা।

কটা মানুষের কথা চিন্তা করতে বলছেন?

এই আমরা হতভাগ্য যে ক'জন আছি তাদের কথা।

লীনা হাসল। বলল, আপনারা ত কাছে কাছেই আছেন।

আমরা এত কাছে থেকেও যে বড় দূরে আছি। একটা ত দিন।

মণি লীনাকে সহজ সরল হবার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে চাইল।

বেশ বলুন কি করতে হবে! সোজা হয়ে বসল লীনা।

আপনাকে রান্না করতে হবে।

তবে খেতে পারবেন না।

সে দেখা যাবে।

শীলা এতে অপমান বোধ করছিল। প্রতিবার শীলাই দেখে শুনে রান্না করে। এবারে লীনা যাচ্ছে। মণি লীনাকে রান্নার কথা বললে শীলার কি করণীয় থাকল এমন একটা ভাব এখন চোখে মুখে শীলার। এ ভাবটুকু ধরা পড়ে যাবে ভাবতেই শীলা লীনাকে জড়িয়ে ধরে বলল, এবার তুই রান্না কর লীনা। একটু পা ছড়িয়ে বসা যাবে।

লীনার কথাটাতে সকলেই গুরুত্ব দিচ্ছে দেখে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করে ফেলল, তুই কি পাগল শীলা, আমি রান্না করতে পারি। আমি রান্না করলে তোরা খেতে পারবি। তুই ত সব জানিস শীলা। আমি কত ভীতু মেয়ে। বিশেষ করে রান্নার ব্যাপারে।

গান না জানলে যেমন রঙ্গরস করার জন্য আপনার একটা গান গাইতেই হবে বলে যেমন সকলে মিলে প্রায় সমস্বরে বলতে থাকল, লীনা এবার তুমিই রান্না করবে। যা রান্না করবে তাই আমাদের অমৃত সমান।

অমৃত সমান না ছাই। আমি পারব না।

পারতে হবে। কেতকী গলা মেলাল।

মরে গেলেও পারব না। লীনা জেদ দেখাতে থাকল।

কেন পারবে না। রান্নাটা এমন কি কাজ! শুভেন্দু বেশ অবিভাবক সুলভ ভঙ্গীতে কথাটা বলল।

আমি কোনদিন রান্না করিনি।

রান্না করিনি! কচি খুকি! বলে শীলা চিবুক ধরে টানল।

আমি সত্যি বলছি পারব না। আমার আন্দাজ বড় কম। কি কতটা দিতে হয় কিচ্ছু ঠিক করতে পারি না।

বেশ একটা মুখরোচক তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে গাড়ির ভিতরটা সরগরম হয়ে উঠেছে। সকলের ইচ্ছা লীনা রান্না করুক, লীনাকে বাধ্য করা হোক রান্নার জন্য লীনার প্রতি এই

উৎপীড়ন সকলেই প্রায় উপভোগ করছে। লীনার কান্না এসে গেছে প্রায়। সে বেশ বিব্রত বোধ করছে।

লীনাকে আমি ইসারা করলে সে উঠে এসে আমার পাশে বসল। তারপর কানে কানে সামান্য কথা, লীনা খুব খুশী, সে বলল, আচ্ছা আমিই রান্না করব।

শীলা জানত লীনা এই রান্নার ব্যাপারে উদাসীন। ওর পেছনে লাগবার জন্য সকলে এমন করছিল। যখন যথার্থই সে রান্না করবে বলছে, যখন ওর রান্না সম্পর্কে সহসা এত উৎসাহ—গোটা উৎসবটাই না মাটি করে দেয়, সেজন্য শীলা না বলে থাকতে পারল না, আগে তাঁবু ফেলি তারপর দেখা যাবে।

ওসব কথা চলবে না শীলা। রান্নাটা আমিই করব।

কেতকী বলল, ঠিক আছে তুমি করবে। শীলার দিকে তাকিয়ে বলল, রান্না করুক না শীলা। যেন কেতকীর বলার ইচ্ছা আমরা সকলেই আপনজন, এসেছি দূরের মাঠে পিকনিকে, শুধু ভোজনের নিমিত্ত আসা হয়নি, উৎসবের মত এই ঘটনা, সামান্য খাদ্যবস্তু কে কেমন রাঁধল সেটা বড় কথা নয়, উৎসবে কে কেমন গলা মেলাতে পারলাম সেটাই বড় কথা

শীলা আর কিছু বলল না। আর শীলার এও ধারণা হল মুরগীর ঝোল কেউ খেতে পারবে না। ঘি ভাত করার নিয়ম কানুন, কতটা ঘি দিতে হয়, কটা তেজপাতা লবঙ্গ জাফরান দিতে হয় লীনার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। বড় আদুরে মেয়ে, সুখী সুখী ভাব, আদরে এবং আহ্লাদে মানুষ লীনা। বড় বাড়ি, বড় গাড়ি, স্বামী জাহাজের বড় অফিসার। লোকজন ঝি চাকরের ভিতর বড় হয়েছে লীনা। শুধু প্রসাধনের ব্যাপারে ওর নিজস্ব একটা রুচী আছে। আর সবটাই বাবা মায়ের করে দেওয়া। এমন কি এই অফিসার মানুষটি যে তার জীবনের নায়ক, জাহাজে ভেসে বেড়ায়—তাও বাবা মার ঠিক করে দেওয়া।

শীলা বলল, আমি কিন্তু কিচ্ছু তোমাকে বলে দিতে পারব না। শীলা লীনাকে ভয় দেখাতে চাইল।

দিতে হবে না।

আমরা সকলে ঘুরে বেড়াব।

বেড়াও।

তোমার দূরবীণ আমাদের হাতে থাকবে।

না তা হবে না।

তালে তুমি রান্না করবে না দূরবীণ চোখে দিয়ে বসে থাকবে?

সে আমি বুঝব।

মণি আমার দিকে কিঞ্চিত চোখ তুলে সামান্য হেসে বলল, কেমন বুঝছ!

কি বুঝব।

খুব ত মই দিয়ে গাছে তুলে দিয়েছ।

কোথায় আবার মই দিয়ে গাছে তুলে দিলাম!

ফিস ফিস করে কি বলেছ বলত। কানে কানে মুখ লাগিয়ে বলল মণি!

কিছুই বলিনি।

তবে এত অহঙ্কার কিসের।

অহঙ্কার কোথায় দেখলে। আমিও মণির কানে কানে উত্তর দিলাম।

শুভেন্দু চিৎকার করে উঠল, যা বলবে জোরে জোরে বলবে। কানে কানে কথা এখানে চলবে না। কোন গোপন কথা থাকলে বাড়ি গিয়ে বলবে।

মণি বলল, তুই চুপ কর শুভেন্দু। আমাদের একটা সিরিয়াস আলোচনা হচ্ছে।

কিসের আলোচনা? লেখার?

মণি ঠাট্টা করে বলল, না নাটকের।

নাটক লেখা ত এখন ছেড়েই দিয়েছি।

ছেড়ে দাওনি, বল নিজেরা এখন ঘরে বাইরে নাটক করছ।

শীলা বলল, আপনি ভারি অসভ্য।

অসভ্যতা কোথায় দেখলে!

শীলা উত্তর করল না। মুখ গোমড়া করে বসে থাকল। মণি ধরতে পেরে বলল, এখানে কারো গোমড়া মুখ দেখানো চলবে না। গোমড়া মুখ দেখাতে হয় যে যার বাড়ি গিয়ে যার যার মানুষকে দেখাবে। মণি জনান্তিকে যেন কথাটা বলল।

শীলা এবার ফিক করে হেসে দিল—আপনি না! মণিকে বোধহয় কিছু বলার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখল গাড়িটা বাজারের ভিতর ঢুকে গেছে। এখন আর কথা নয়। সকলে নেমে পড়লাম। গাড়িটা একপাশে পার্ক করানো হল। যা যা আমরা সহর থেকে আনিনি, এখানে সব আমরা কিনে ফেললাম। পিছনে ফিরে দেখি কেতকী নেই। কোথায় কোথায়! তারপরে দেখি কেতকী একটা তালপাতার টুপি মাথায় দিয়ে ছুটে আসছে! হাতে ওর আরও পাঁচটা টুপি। সে একটা একটা করে সকলকে দিয়ে আমারটা কেন জানি আমাকে দিল না। নিজের হাতে রেখে দিল।

আমি বললাম, আমারটা।

কেতকী বলল, দেব না।

কেন? আমার কি অপরাধ?

ফিস ফিস করে লীনার কানে কানে কি বলেছেন বলুন।

আমি হো হো করে হেসে দিলাম,। বললাম, এত আগ্রহ কেন বলুন ত?

একেবারে সঞ্জীবনী সুধা। বেচারা অথৈ জলে ডুবে যাচ্ছিল রান্নার নামে, আপনি কি বলতেই প্রায় ইংলিশ চ্যানেল পার করে দেবার মত ব্যাপার। অহঙ্কারে এখন মাটিতে পা পড়ছে না।

কেতকীকে আমার বলার ইচ্ছা হল সঞ্জীবনী সুধা আমার কাছে

আপনার জন্যও সঞ্চিত আছে। চাইলেই দিতে পারি। কিন্তু কেতকীকে সব খুলে বলা যায় না। কেতকীর কাছে তালপাতার টুপি, কেতকীর ইচ্ছা যেন এই তালপাতার লোভ দেখিয়ে সব জেনে নেয়।

হাঁটছিলাম আমরা। গাড়ি নিয়ে শুভেন্দু টুরিষ্ট লজটা পার হয়ে মাঠের ভিতর নেমে গেছে। নদী থেকে হাওয়া উঠে আসছিল। চারধারে মানুষজন, সব সহর থেকে মানুষেরা পিকনিক করতে এই অঞ্চলে চলে এসেছে। মাইক বাজছিল, হাঁস মুরগী ডাকছিল, নদীর জলে নৌকা আর আমার পাশে থেকে থেকে কেতকী তালপাতা টুপির লোভ দেখাচ্ছে।

কি বলেছেন বলুন ?

আপনার কি মনে হয় ? আমি ওকে কি বলতে পারি ?

কেতকী বলল, জানলে আপনাকে বলব কেন ? ষ্ট্রেঞ্জ ! যে রান্নার নামে এত ভয় খাচ্ছিল সে এখন একরোখা, বলছে সে রান্না না করে ছাড়ছে না।

আমার সঙ্গে লীনার একটা গোপন চুক্তি হয়ে গেছে। বলেছি রান্নার রহস্যটা ভেদ করা চলবেনা।

ভারী আমার রহস্য ! কেতকী ঠোঁট উল্টে ঠিক কিশোরী মেয়ের মত মুখ করতে চাইল। বয়সের দরুণ সে মুখের লাস্য ফুটে উঠছে। এই লাস্য দেখলে আমার ভিতরে একটা প্রাণপাখি কেমন হাহাকার করে ওঠে। কেতকীকে পাশে পাশে হাঁটতে দেখে ভিতরের হাহাকারটা বেড়ে যাচ্ছিল। সামান্য গোপন সূত্র আমার এবং লীনার ভিতর। এই সূত্র আবিস্কার করে ফেললে লীনার সম্মান বাঁচবে না। সুতরাং অন্যকথায় এলাম, বলুন এতবড় নদী সাঁতরে আপনি পার হতে পারবেন ?

আপনি পারবেন ?

অনায়াসে। আপনি ?

সাঁতারই জানি না। একটু দূরে লীনা এবং শীলা। মণি মাঝখানে। আমি লীনাকে ডেকে বললাম, লীনা তুমি পারবে এত বড় নদী পার হতে?

লীনা আমার কথায় নদীটার দিকে তাকাল। নদীর দিকে তাকাতেই বড় এক জাহাজ চোখের উপর ভেসে উঠল লীনার। জাহাজটা বন্দর থেকে সাগরে নেমে যাচ্ছে। সে দূরবীণ নিয়ে জাহাজের নামটা পড়ল, শীলা দূববীণটা হাতে নিয়ে জাহাজের মানুষ জন দেখতে থাকল। আমি কিন্তু দূরবীণ চোখে দিযে দেখলাম, কোন কোম্পানীব জাহাজ, কোন দেশের জাহাজ। ফানেল দেখলে কোম্পানী চেনা যায, নিশান দেখলে কোন দেশের চেনা যায়। আমি লীনাকে বললাম, কর্তার শেষ চিঠি কবে পেয়েছ।

সতের দিন আগে।

কোন বন্দর থেকে লিখেছে?

ফ্রি-মেণ্টেল থেকে।

জাহাজ কবে ছাড়ছে তা কি লিখেছে?

হ্যাঁ লিখেছে। যেদিন চিঠিটা পেয়েছি সে দিনেই ওদের জাহাজ ছাড়ার কথা।

সতের দিন। অষ্ট্রেলিয়ার ফ্রি মেণ্টেল বন্দর থেকে কলকাতায় পৌঁছাতে এমনি একটা সময়ের দরকার। হিসাব করে বললাম, তোমার মানুষটি ত তবে আজ কালই নদীতে উঠে আসবেন। কিন্তু ঝড়ে পড়লে দেরি হতে পারে।

লীনার মুখে সেই দুঃখের আবেগ। সে বলল, এ-সময়টাতে ঝড় কম।

সমুদ্রে ঝড় কখন থাকে, কখন থাকে না বলা মুস্কিল লীনা। আমি ত ঝড়েই বেশী সময় সমুদ্র সফর করেছি।

লীনা এবার আমার পাশে এসে দাঁড়াল। বলল, ঝড়ের সময় খুব কষ্ট হয় আপনাদের?

তা হয়।

কিন্তু জানেন মানুষটি আমায় ঝড়ের কথা কোনদিন বলে না। সুবিধা অসুবিধার কথা বলে না। খুব সুখে সফরে সফরে সমুদ্রে পাড়ি দেয় যেন, কত বলি যেয়ে কাজ নেই, কিনারায় একটা কাজ দেখে নাও। তা কিছুতেই শুনবে না। আমার ত দিন কাটে না। বলে লীনা কেমন ছেলেমানুষের মত মুখ ঘুরিয়ে নিল এবং আমরা সকলে যাতে করে ওর মুখ দেখতে না পাই তার জন্য সে নদীর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকল।

পাশে দাঁড়ালে লীনা বলল, আপনার ইচ্ছা হয় না ফের সমুদ্রে যেতে?

এ কথা কেন লীনা?

সে ত বলে সমুদ্রে গেলে আর ফেরা যায় না।

ঠিকই বলে।

সমুদ্র কেবল ওকে টানে। কিন্তু আপনাকে টানে না? আপনি ত কত সফর দিয়েছেন সমুদ্রে।

চার পাঁচ সফর।

তারপর আর গেলেন না কেন?

এত বড় সমুদ্রে আমার মাথা ঠিক থাকত না। বন্দরে নামলে কোথাও কেবল হারিয়ে যেতে ইচ্ছা হত। নিয়তি বুঝতে পেরে ওর বাপকে বলে একটা চাকরি ঠিক করে দিল আমাকে। জাহাজে আর যেতে দিল না।

দেখুন ত আপনি কত ভাল মানুষ।

কিন্তু কি জান লীনা সমুদ্রে যারা যায়, তারা বড় ভাগ্যবান আমার কাছে। সারাদিন পর কাজে ক্লান্তি এলে সমুদ্রের নীল জল আমার চোখে খেলা করে বেড়ায়। মাঝে মাঝে সমুদ্রের জন্য অনমনস্ক হয়ে পড়ি।

লীনা চুপচাপ আমার কথা শুনে যাচ্ছিল। সমুদ্রের কথা মনে

হলেই যেন কাব্য করতে ইচ্ছা হয়। বস্তুত সমুদ্র এখন আমার কাছে প্রায় স্বপ্নের মত। কত দুঃখ কষ্টের দিন রাত্রি সমুদ্রে আমাদের অতিবাহিত করতে হয়েছে। ঝড়ের সমুদ্রে রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে কাটাতে হয়েছে। শুকনো খাবার খেয়েছি—তবু মনে হয় সবটা মিলে এখন স্বপ্নের জগত। বন্দরের লাল-নীল আলো এখন আর কোথাও জ্বলতে দেখি না। আমি লীনার দিকে এবার স্পষ্টভাবে তাকালাম। ওর চোখে কালো চশমা নেই। ওর চোখে সেই লাল নীল আলো জ্বলতে দেখলাম। মানুষটার জন্য ওর চোখে ঘুম নেই, কোনো কোনো সময় সেই মানুষটার জন্য ভাবতে ভাবতে লীনা আপন মনে এক অদৃশ্য ইচ্ছার জগতে ঘুরে বেড়াতে থাকে। লীনার সুন্দর চোখ, সবল এবং পুষ্ট বাহু, সুন্দর শরীর আর পায়ের মাংসে কি নরম যাদু আছে মনে হলে—লীনাকে বললাম, মানুষটি ফিরে এলে আমার কথা বলবে।

নিশ্চয় বলব।

বলবে আর একজন নাবিকের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে। যে মানুষটা এখন আর সমুদ্রের মানুষ নয় কিনারার মানুষ। কিন্তু মনে মনে মানুষটা এখনও সমুদ্রেই পড়ে আছে। সে তার জীবনে লাল নীল বাতি ফের জ্বালাতে চায়।

বলব।

বোধহয় এই নদী দেখে এবং নিরিবিলি আকাশ দেখে আমার কাব্য করতে ইচ্ছা হচ্ছে। অথবা এও হতে পারে লীনার চোখ মুখ, ওর লাবন্য এবং সমুদ্রের গল্প ফের আমাকে সমুদ্রে অথবা নদীতে ঝাঁপ দিতে বলছে। সাঁতার কাটতে বলছে। আমি বললাম, লীনা তোমার মানুষ বড় নিষ্ঠুর।

লীনা জবাব দিল না। লীনা কি রুষ্ট হল এমন কথায়। লীনার মানুষকে নিষ্ঠুর বলে লীনাকে কি ছোট করে দিলাম। লীনা, খুব আস্তে আস্তে ডাকলাম।

বলুন।

নিষ্ঠুর বলায় তুমি কি রাগ করলে?

না। রাগ করব কেন বলুন। নিষ্ঠুর না হলে পারে এমন ভাবে একা ফেলে সমুদ্রে ঘুরে বেড়াতে!

তুমি পারনা ওকে ধরে রাখতে।

কিছুতেই পারছি না সরলবাবু।

এই প্রথম লীনা আমাকে সরলবাবু বলল। আমি বললাম, লীনা তুমি মানুষটার মন জান না।

লীনা হয়ত উত্তরে বলতে পারত মানুষটার মন আমি ভাল জানি সরলবাবু। মানুষটা এসেই ক্ষুধার্ত বাঘের মত হালুম হুলুম করবে। সারা দিনরাত চাটবে, শরীরের গন্ধ নেবে। পাগলের মত করবে, কত রকমের সব গল্প তখন, কোথাও আর যাবে না। সমুদ্র ভয়ঙ্কর জায়গা—তখন দু দণ্ড সে এই লাবণ্যে ভরা যুবতীকে ফেলে কোথাও যায় না। এই যুবতীই সব তার। প্রায় সমুদ্রের স্বাদ এই যুবতীর শরীরে। কোথায় কোন অতলে যুবতী তার নোনা জলের নীল অন্ধকার লুকিয়ে রাখে, কোথায় কোন অসীমে ভালবাসার নক্ষত্রটিকে সে লুকিয়ে রাখে কেবল সেই সব অনুসন্ধানের ইচ্ছা। আর কিছু যেন নেই। যুবতীরও তখন যাদুকরের ভেল্কি শরীরে। উষ্ণতা বার বার মরেও মরে না। বার বার সেই রক্তের ভিতরে যে ক্ষুধা আছে পরিপাটি করে ভোজনের নিমিত্ত কেমন চিৎপাত হয়ে কেবল পড়ে থাকা। তুমি আমায় ভোগ কর। সমুদ্রের মানুষ তুমি আমায় দানবের মত ভোগ কর। আমার শরীরের সর্বত্র, সব লোমকূপে তুমি গোলাপ ফুল হয়ে ফুটে থাকো।

বুঝি এখন লীনার চোখে সেই লাল নীল বাতি জ্বলছে। যে বাতি দেখলে ঝড়ের জাহাজ পথ খুঁজে পায়।

এবার বললাম, চল লীনা। ওরা অনেক দূরে এগিয়ে গেছে।

দুজনে চুপচাপ পারে পারে হাঁটছিলাম। ঠাণ্ডা হাওয়া ক্রমশ

কমে আসছে। সূর্য উঠে যাচ্ছে উপরে। নদী থেকে কিছু পাখি সমুদ্রে নেমে যাবার জন্য আকাশে উড়ছে।

আমি লীনাকে পাখি দেখতে বললাম—দেখ কত পাখি আকাশে উড়ছে।

কত পাখি তাই না!

অনেক পাখি। সমুদ্রে যখন কিছু দেখা যেত না আমরা তখন সমুদ্রে পাখি দেখার চেষ্টা করতাম। সমুদ্রেব পাখি। ওবাই আমাদের কাছে কিনারার দূত ছিল।

লীনা যেতে যেতে বলল, সরলবাবু আপনি ত লেখেন।

এই সামান্য।

আপনার কিছু লেখা আমি পড়েছি।

এই রে। বলে আমি সরল তাড়াতাড়ি পা ফেলার চেষ্টা করলাম। লেখার কথা কেউ বললেই এই সরল ভয় পায়। কারণ লেখার চরিত্রগুলো সম্পর্কে এমন সব প্রশ্ন ওঠে যে মাঝে মাঝে সরল নিজেই অবাক হয়ে যায়—সে ত এমন কবে ভেবে দেখেনি, সে ত তার চরিত্রকে সাদা মাটা সরল অকপট মানুষ করতে চেয়েছে—যত সরল অকপট মানুষ করতে চেয়েছে তত ওরা নাকি ভয়ঙ্কব চরিত্র হয়ে গেছে। নানা ভাবে এসব বিতর্কে মাঝে মাঝে যোগদান করতে গিয়ে সরল সঠিক ব্যাখ্যা করতে পারেনি। পরাজয়ের গ্লানিতে তখন ডুবে থাকতে হয়েছে। সুতরাং যত জোরে পারা যায়া হাঁটা ভাল। সে দ্রুত হাঁটতে থাকল। কেতকী এবং শীলাকে ধরার জন্য যেন সে দ্রুত হাঁটছে।

লীনা ডাকল, সরলবাবু আমাকে ফেলে চলে যাচ্ছেন!

তাড়াতাড়ি হেঁটে এস। বেলা হয়ে গেছে। রান্না করবে বলছ। দেরি করলে কখন কি করবে।

লীনা ছুটতে চাইলে আমি থামলাম। লীনা কাছে এলে বললাম, মাংসের মশলাটা এবার মুখস্ত করে রাখ। এক নম্বর হলুদ, লঙ্কা,

আদা কিছু আস্ত টমেটো। টমেটো ঝোলে দেবে। তেল তেজপাতা লঙ্কা, আদা, নুনটা আমাকে দেখিয়ে নেবে। মেখে রাখবে সামান্য সময়। আধপোয়ার মত দই দেবে। কিছুটা নামার আগেও দিত পার।

দোহাই সরলবাবু, এখন সব বললে ভুলে যাব। আপনার একটা গল্পে ছিল না মৈত্র বলে একজন নাবিক—বৌকে টাকা পাঠাবে বলে বন্দরে নেমে জুয়া খেলতে লেগে গেল।

ছিল।

সে মাঝে মাঝে একটা স্বপ্ন দেখত।

কি স্বপ্ন বল ত ? আমি ঠিক মনে করতে পারছি না।

বন্দরের সামনে কিছু পাইন গাছ ছিল। একটা বড় লম্বা পাইন গাছের সে প্রায়ই স্বপ্ন দেখত যেন কিনরার লোকেরা একটা তিমি মাছের কঙ্কাল ঝুলিয়ে রেখেছে।

হ্যাঁ হ্যাঁ এতক্ষণে মনে পড়েছে।

আচ্ছা তিমি মাছের কঙ্কালটা আপনার গল্পে পাইন গাছে ঝোলানোর কি দরকার ছিল।

সত্যি এখন ভাবছি কি দরকার ছিল।

কিন্তু কি জানেন গল্পটা পড়ার পর মনে হয়েছে কঙ্কালটা না ঝোলালে গল্প আপনার জমত না।

কোথায় ঝোলালে ঠিক হত।

একটা বাঁশ গাছে।

ওদেশে বাঁশ গাছ নেই।

ওটা ত সরলবাবু গল্পের বাঁশ গাছ। লাগিয়ে দিলেই হল।

বুঝলাম লীনা আমাকে ঠাট্টা করছে। শক্ত জবাব দেব ভাবলাম। কিন্তু মুখের দিকে তাকাতেই কেমন মায়া হল। লীনা বড় বেশি কাছে কাছে থাকছে। সে আমাকে সামান্য বিদ্রূপ করে হয়ত মজা পাচ্ছিল। কিংবা এও হতে পারে ভোর থেকে সে আমাকে লক্ষ্য

করছে। আমি কেতকীকে বেশ রসে বসে দেখছিলাম। আমার চোখে আগুনের উত্তাপ ছিল, লীনা বোধহয় টের পেয়েছে। সে মনে মনে আমাকে নিয়ে বোধ হয় খেলা করছিল।

লীনা তোমাকে আমি শক্ত জবাব দিতে পারি। কিন্তু দেব না। তোমার মানুষ সমুদ্রে গেছেন। বাকিটুকু বললাম না। বললে আরও তিক্ত শোনাত।

লীনা চোখ তুলে তাকাল। 'সমুদ্রে গেছেন' কথাটাতে কি যেন এক গভীর রহস্য। সে সেই রহস্য বুঝি এই শীতের সকালে ধরতে পারছে না। সে বলল, সমুদ্রে যারা যায় সরলবাবু, তাদের আমি বিশ্বাস করি না।

তোমার মানুষটিকেও না।

নিজের মানুষটির কথায় এলে লীনা কেমন বিব্রত বোধ করতে থাকল। কেবল নিজের মানুযটিকে সৎ এবং সাহসী মনে হয়। লোনা জলের ভিতর ডুব দিলে শরীরে জ্বালা, এক রকমের জ্বালা যা পরে ফিরে এলে টের পাওয়া যায়। লীনা বোধহয় এখনও তা টের পায়নি।

আমরা গল্প কবতে করতে টুরিষ্ট লজটা পর্যন্ত হেঁটে এলাম। শীলা এবং কেতকী টিকিট কেটে দোতালায় ওঠে গেল। লীনার দিকে তাকিয়ে বললাম, তুমি যাবে নাকি ?

অনেকক্ষণ পথে একসঙ্গে থেকেছি! বোকার মত এই প্রশ্নে লীনা কিছুটা আমাকে সহজ মানুষ ভেবে নিল। বলল, আপনি উপরে যাবেন না ?

না।

তবে আমি একটু ঘুরে আসি।

এই ঘুবে আসা মেয়েদের সময়ে অসময়ে দরকার হয়। চারিদিকে গ্রাম মাঠ এবং নদীব জল, মানুষজনের ভীড়, সুতরাং টুরিষ্ট লজটা মেয়েদের সামান্য বিশ্রামের পক্ষে বড় উপযোগী। ঠাণ্ডা বাতাস এবং

কালো রঙের দরজায় কেবল স্ত্রীলোকেদের জন্য লেখাটা মনে পড়তেই আমি নিজের ভিতরে নিজে গুটিয়ে গেলাম।

কেবল পুরুষদের জন্যে ঘরটাকে ঘুরে এলে হত। লীনার পিছনে পিছনে আমি গেলাম। একতলার জন্য টিকিটের পয়সা কম। দোতালার জন্য বেশি পয়সা। পয়সা বেশি গুনে দিতে দিতে বললাম, দোতালায় নিশ্চয়ই বাঘ ভাল্লুক আছে।

যিনি টিকিট বিক্রি করছিলেন তিনি আমার কথা শুনে হাসলেন। লীনা হাসল না। লীনা কেমন ক্রমশঃ আমার উপর বিরক্ত হয়ে পড়েছে। লীনা কি ধরতে পেরেছে মানুষটা ভেজা বেড়াল। অথবা এও হতে পারে লীনা আপন মনে ডুবে ডুবে মানুষটার কথা ভাবছে, আমাদের কথা ভাববার সময় পাচ্ছে না। ওর পিছনে পিছনে আমি সিঁড়ি ভাঙছি, দুবার দু'একটা কথাও বললাম, কোন উত্তর নেই। কিন্তু দোতালায় উঠিতেই দূরে মোহনার দিকে সেই জাহাজটাকে আমরা দেখতে পেলাম। বাজারে যে জাহাজটার ডেক, মাস্তুল এমন কি ফল্কা স্পষ্ট ছিল, এখন শুধু মাস্তুল দেখা যাচ্ছে। বললাম, লীনা ছাখো ছাখো।

লীনা এবার দাঁড়াল। দোতালার বারান্দায় দাঁড়াল। ভিতরে কাঁচের ঘর, বড় বড় কাঁচের জানালা, সুরম্য প্রাসাদের মত এই সরকারী টুরিষ্ট লজ। দামী সোফা, কার্পেট পাতা এবং হাল ফেসানের যুবক যুবতীরা ভিতরে বাইরে পায়চারি করছে। লীনা আমাকে দূরবীণটা দিয়ে বলল, আপনি দেখুন, আমি আসছি।

শেষ জোয়ারে কিছু কিছু জাহাজ নেমে যাচ্ছে কিছু কিছু জাহাজ এবার উঠেও আসবে। দূরবীণটা দিয়ে সে আমাকে পাহারায় রেখে গেল যেন। একা রেলীঙে দূরবীণ চোখে দাঁড়িয়ে থাকলাম। কত দূরে দূরে আমি কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছি। ঘরে আমার ভালবাসার স্ত্রী এবং প্রিয় বুনো আছে। কিন্তু এই টুরিষ্ট লজের বারান্দায় দাঁড়িয়ে মনে হল এক লীনা, লীনার শাড়ীর গন্ধ এবং কি এক মনোরম আতর

লীনা শরীরে মেখে রেখেছে—আমি লীনাকে কিছুতেই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে পারছি না দূরবীণের কাঁচে শুধু লীনার মুখ দেখতে পাচ্ছি।

লীনা চোখে মুখে জল দিয়ে এল। দূরবীণে আমি কি দেখছিলাম বললে খুবই বিব্রত বোধ করতাম। কারণ কিছুই দেখেছিলাম না। কেবল এক পাখি আকাশে উড়ে বেড়ায়—সে পাখি অনন্ত এক ভালবাসার পাখি। পাখির মুখের গড়ণ কত রকম ভাবে যেন দূরবীণের কাঁচে পাল্টে যাচ্ছিল। লীনা আমাকে প্রশ্ন না করে বলল, যান হাত মুখ ধুয়ে আসুন।

আমি একান্ত অনুগত ছাত্রের মত লীনার হাতে দূরবীণ রেখে 'কেবল পুরুষদের জন্য' ঘরটাতে ঢুকে গেলাম।

কেতকীর মত লীনা এত লম্বা নয়। বাথরুমের আয়নায় আমার প্রতিবিম্ব ভাসতেই কথাটা মনে হল। আমার চোখে-মুখে সামান্য অবসাদ লেগে আছে খুব ভোরে ওঠার জন্য বোধহয় এই অবসাদ। গরম জল ঠাণ্ডা জল দুই আছে। কোনটা খুলব ভাবতে পারছিলাম না। দুটোই খুলে দিলাম এক সময়। একটা বালতিতে জল মেশালাম। হাতে মুখে সাবান ঘসে সামান্য গরম জলে মুখ ধুয়ে দেখলাম বেশ তাজা মনে হচ্ছে মুখটা। আমার প্রসাধন করার অভ্যাস নেই। লীনা অথবা কেতকী এবং লীনার প্রসাধনে পাল্লা দেবার মত। সেই লীনা প্রসাধন ধুয়ে মুছে ফেলল। কারণ ওর চোখে মুখে জল লেগে ছিল। রাত জাগলে যেমন দেখায় দু ঘণ্টায় লীনার মুখ প্রায় তেমন দেখাচ্ছিল। রাত জেগে ভোরের দিকে মুখ ধুয়ে এলে যেমন দেখায় বারান্দায় লীনাকে তেমন দেখাচ্ছিল। সাধা সিধে পোষাক পড়লে প্রায় নিয়তির মত। নিয়তির মত কোমল অবয়বের চেহারা নিয়ে লীনা আমাকে বলছে, হাত মুখ ধুয়ে আসুন।

বার বার আয়নায় মুখ দেখলাম। আমার বয়স কত? হিসাব করলে উত্তর ত্রিশের যুবক আমি। কিন্তু মুখে চোখে আমারও একটা লাবণ্য আছে, নিয়তির কাছে আমার এ-ব্যাপারে একটা অহঙ্কারও

আছে, সব সময় মুখের রেখায় আমি এক তরুণ যুবক, আমার বয়স নেই, আমার শুধু ভালবাসা আছে। এই ভালবাসার সুখ আমি লীনাকে দেখাতে পারলে বাঁচি।

বাথরুমে আমার দেরি দেখে লীনা অন্য কিছু ভেবে ফেলতে পারে, লীনা হয়ত আমার জন্য বারান্দায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে, সুতরাং তাড়াতাড়ি বের হয়ে পড়লাম। পিছনের দিকে বারান্দায় দাঁড়ালে রেল লাইন। ঝিল, এবং একটা বড় বাড়ি গ্রামের ভিতর চোখে পড়বে। ঝিলে নানা রকমের শাপলা সালুক, হেলাঞ্চা আর নিচে নানা রকমের ঝোপ জঙ্গল। এক যুবক অন্য এক যুবতীকে নিয়ে ঝোপের পাশে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি বললাম—বাহবা যুবক। তোমার ধর্ম তুমি করছ। তাড়াতাড়ি বারান্দা ঘুরে না গিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে অন্য দরজায় উঁকি দিয়ে দেখলাম লীনা সেখানে নেই। সে-নিচে নেমে গেছে। সে কেতকী এবং শীলা একসঙ্গে নদীর পার ধরে হাঁটছে। আমার জন্য লীনা এখানে আদৌ অপেক্ষা করে নেই।

মনে মনে বললাম, যুবতী তুমি বড় চালাক। তোমার মানুষ সমুদ্রে আছেন বলে তুমি অন্য মানুষকে অহঙ্কার দেখাচ্ছ, সমুদ্রে আমিও ছিলাম—কোন সমুদ্রে কোন পাখি উড়লে ঝড় ওঠে আমার সব জানা। তোমাকে আমি ঝড়ের খেলা দেখাব। বলে আমি বন্দরে নেমে গেলে যেমন শিস দিতাম হাঁটতে হাঁটতে তেমনি শিস দিতে দিতে সিঁড়ি ভেঙ্গে নিচে নেমে গেলাম।

মাঠে নেমে দেখলাম আমাদের গাড়িটা পার্ক করা আছে। কিন্তু শুভেন্দু নেই। সকাল থেকেই সহর থেকে সেই যে লোক এসে জড় হচ্ছে আর থামছে না। গোটা মাঠ ভরে গেছে। নদীর ধারে ধারে উনুন, কোথাও রান্নার আয়োজন প্রায় শেষ, এখন শুধু উনুনে বসিয়ে দিলেই হল। যারা মাইক বাজাচ্ছিল তারা বড় ট্রাকের নিচে সতরঞ্চি পেতে শুয়ে আছে। বড় বড় ট্রাক, ল্যাণ্ডেগু মার্কা ট্রাক সব সারি

সারি মাঠের এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে। দক্ষিণের দিকে ক্রিকেট খেলছে একটা দল। ওদের বোধহয় মা মাসীরা এসেছে। ছেলেরা একদিকে আর মেয়েরা একদিকে। সব জাহাবাজ মেয়ে। শালোয়ার পরে একটা মেয়ে বল ধরার জন্য ছুটছিল। ছুটতে ছুটতে পড়ে গেল। অজ্ঞাতে আমি শিস দিয়ে ফেললাম। মেয়েটা আমার দিকে তাকাল – বোধহয় অসভ্য বা অন্য কোন ইতর গালি দিয়ে উঠে পড়ে ফেব বলটা ধরার জন্য ছুটল।

কে আছে এমন যে এখন আমাকে সভ্য ভব্য করে তোলে! অনেকদিন পর সহর ছেড়ে বেব হয়েছি, মনে হয় অনেকদিন পর একটু প্রাণ খোলা হাসি, আনন্দ, কোন বন্ধন নেই, বন্ধনহীন জীবনের সেই স্বাদ সমুদ্রের মত স্বাদ, আমাকে ভিতরে ভিতরে তাড়া করছে। এখন হাতে একটা লাঠি থাকলে মাথার টুপি হাতে থাকলে যেমন বন্দরে নেমে লাঠিতে আমি টুপির খেলা দেখাতাম তেমন খেলা দেখাতে দেখাতে এই মাঠ এবং মানুষজন পার হয়ে যেতে পারি। কিন্তু হাতে আমার না টুপি, না লাঠি। পা ফাঁক করে হাঁটা শুধু।

শুভেন্দুকে কোথাও দেখছি না। ওরা কোন দিকটাতে গেল! দক্ষিণের দিকে উঁচু একটা ঢিবি আছে। সুতরাং ছুটে ছুটে সেই বড় ঢিবিটার উপরে উঠে গেলাম। কোন পুরণো দুর্গের মত এই ঢিবির উপব দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকালাম। উত্তরে দিকে ছোট্ট ঝিলটাতে মানুষজনের কোনো ভিড় নেই, কিছু নারকেল গাছ এবং খেজুর গাছ প্রায় কুঞ্জবনের মত করে রেখেছে, সেখানে শুভেন্দুকে দেখা গেল। একা একা শুভেন্দু মাটি খুঁড়ছে।

প্রথম প্রথম শুভেন্দুকে আমার বাউণ্ডুলে স্বভাবের মনে হত। কিন্তু এখন দেখছি সেই করিতকর্মা লোক। খাটছে খুব। নিতাই ওকে জল এনে দিতে সাহায্য করছে। ঢিবির উপর দাঁড়িয়ে সেই তিন যুবতীকে আবিষ্কারের চেষ্টা করলাম। ওরা যেন কোথায় ছাড়া ছাড়া হয়ে ঘুরছে। মণিটাকে পর্যন্ত দেখতে পেলাম না।

নিচে নেমে শুভেন্দুকে কিছু না বলেই ঝুড়ি থেকে চারটা মুরগী টেনে বের করলাম। তারপর কেমন অবলীলাক্রমে মুরগীর গলা চারটা ব্লেড দিয়ে কেটে দিতেই ওরা এসে হাজির। হাতে চারটা মুরগী, মুরগীর রক্তে হাত ভিজে যাচ্ছে। কেতকী বলল, আপনি অসম্ভব রকমের নিষ্ঠুর।

আমি লীনার দিকে তাকালাম, লীনা তুমি কি বলছ ?

লীনা বলল, জামা কাপড় না ছেড়েই লেগে পড়েছেন। একটু অসাবধান হলে কিন্তু সব যাবে।

লীনা তুমি চতুর, তুমি বড় চতুর এই চাতুর্য ধরা পড়ে গেলে ঘরের মানুষ কেবল বিবাগী হতে চায়। তুমি আমাকে কেবল এড়িয়ে যেতে চাও। এটুকু ভেবে মুরগীর গলা চারটা একসঙ্গে ছেড়ে দিলে তিনটে মুরগী নিচে গড়িয়ে পড়ল—শুধু একটা মুরগী শেষবারের মত লাফ দিয়ে লীনার পায়ের কাছে পড়তেই চিৎকার করে সরে গেল লীনা। আমার কিন্তু লীনার এই ভীতি এবং চাঞ্চল্য বড় আরামদায়ক মনে হল। কেতকীকে বললাম, এবার কাজে লেগে পড়ুন। শুধু ঘুরে বেড়ালে চলবে না। আর আমার টুপিটা দয়া করে দিন, বড় রোদ লাগছে।

শীলা বলল, রান্না তবে কে করছে ?

শীলার জবাবের প্রত্যাশা না করেই বললাম, লীনা করছে। তোমরা সব ঠিক ঠাক করে দিয়ে তাস খেলায় বসে যেতে পার। লীনাকে যা সামান্য সাহায্য করা দরকার আমি করছি। আর তোমাদের নিতাই চন্দ্র আছে। সুতরাং রান্না হলে পরিপাটি করে খাওয়া।

লীনা বলল, জোয়ার আসবে তিনটাতে। তখন নদীতে জাহাজ উঠে আসবে। আমি কিন্তু বাপু বলে রাখছি তিনটের আগে আমাকে ছুটি দিতে হবে।

তোমাকে ছুটোর আগে ছুটি দিয়ে দিচ্ছি। খুব ফিস ফিস গলায় কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম।

ঝিলের ঠিক পারে—কিছু নারকেলের ছায়ায় এবং মসৃণ ঘাসের ভিতর আমরা পরিপাটি করে সতরঞ্চ বিছালাম। সতরঞ্চের উপর শুভেন্দু, শীলা, মণি এবং কেতকী তাস খেলতে বসে গেল। নিতাইকে নিয়ে একটু দূরে এই ত্রিশ চল্লিশ গজ দূরে একটা চাদর টাঙিয়ে পর্দার মত করে দিলাম। তারপর তাঁবুর মত করে নিচে উনুনে আগুন দিতেই ধোঁয়া উঠতে থাকল। লীনা দাঁড়াতে পারছিল না। আমি বললাম, তুমি আমার কোট হাতে রাখ। আমি আগুনটা ধরিয়ে দিচ্ছি।

কোট এবং টাই খুলে লীনার হাতে দিলাম। লীনা বলল, আপনি সরে আসুন। নিতাই, নিতাই। নিতাই এলে বলল, আগুনটা ধরিয়ে দে। লীনা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আসুন আমরা একটু বসি। উনুনের ধোঁয়াটাও মেরে দিক।

শুভেন্দু তখন চিৎকার করে বলছিল, চা চাই।

লীনা পর্দার এদিকে! সেও চিৎকার করে জবাব দিল, হচ্ছে। বেশি চিৎকার চেচামেচি করলে গরম জল ঢেলে দেব।

লীনা এবং আমি ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে বসলাম। লীনার মুখে এখন প্রসাধন নেই, লীনা দু হাত পিছনে দিয়ে খুব দূরে চোখ মেলে দিল। ওর কোলের উপর আমার কোট এবং টাই। এখন কেন জানি লীনাকে অনাত্মীয় ভাবতে কিছুতেই মন সায় দিচ্ছে না। এখানে এই নারকেলের ছায়া ঘন চত্বরে এবং পাশের ছোট্ট ঝিল, আর মসৃণ এইসব নরম ঘাসে আমরা দুজনে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলাম। কোন কথা বললাম না। এবং একসময় উনুনে আগুন জ্বলে উঠলে লীনা নিতাইকে প্রথম চায়ের জল বসিয়ে দিতে বলে আমার দিকে তাকাল- -জানেন সরলবাবু যেন সে তার জীবনের গূঢ় কোন কথা এবার প্রকাশ করবে। সে বলল, জানেন সরলবাবু কাচা মাংস ঘাটলে সেদিন আমি কিছু খেতে পারি না।

ওটা আমি করে দিচ্ছি।

কিন্তু কি জানেন, কোন কিছুর আন্দাজ আমি ঠিক করতে পারি না।

আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি। তুমি কেবল আমার কোটটা যত্ন করে রাখবে।

তারপর সহসা যেমন বলতে হয় তেমনি বলা আচ্ছা সরলবাবু আপনাব স্ত্রীকে ছেড়ে আপনি যখন সমুদ্রে যেতেন কষ্ট হত না আপনার ?

খুব হত।

এখন কেমন লাগছে আপনাদের।

খুব এক ঘেয়ে। আমি ওঁব কাছে যেন পুতুল, খেলার সমগ্রী।

মানে।

মানে কেবল খাইয়ে দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চায়।

আব কিছু চায় না ?

আমি এবার অন্য কথা বললাম, জানো লীনা তোমাদের সঙ্গে এসে বড় ভাল লাগছে। আমার মনে হয় দম আমার আদৌ ফুরিয়ে যায়নি। এখনও যেন বড় মাঠ পেলে এক নিঃশ্বাসে ছুটে যেতে পাবি।

কতদূর যেতে পাবেন ?

যতদূর বলবে।

লীন বলল, এবারে উঠুন। মাংসটা বসিয়ে দেয়া যাক।

লীনা উঠে দাঁড়াল। ওর খালি পিঠ আমি দেখতে পেলাম। শঙ্খের মত সাদা খালি পিঠে বিন্দু বিন্দু ঘাম। হাত কাটা ব্লাউজ প্রায় ব্রেসিয়ারের মত। পিঠের ভাঁজ প্রকট। নরম সিল্কের ভিতরে ওর পুষ্ট শরীর আমাকে সময়ে অসময়ে বড় কাতর করছে। লীনা নিচু হয়ে চায়ের জলটা দেখে নিতাইকে নামিয়ে নিতে বলল। আমি ওকে নুয়ে পড়তে দেখলাম। শরীরের ভিতরে লীনা কি লুকিয়ে রেখেছে, কি এক রহস্য লুকিয়ে রেখেছে যা আমার নিত্যদিনের

অভ্যাসের জল অথবা লালসার জলও হতে পারে লীনাকে নুয়ে পড়তে দেখে গড়িয়ে পড়ছে। আমি ডাকলাম, লীনা।

লীনা ঘাড় কাত করে তাকাল।

তুমি আমাকে ফেলে চলে এলে কেন?

কোথায় ফেলে চলে এলাম।

টুরিষ্ট লজে।

শীলা আমাকে ডাকল।

ইচ্ছা হল বলার, শীলাকে কি তুমি কিছু বলেছ, শীলা কি টের পেয়েছে আমি তোমার হয়ে সব করে দিচ্ছি। আমি তোমার হয়ে কিছু করছি না লীনা আমি আমার জন্য করছি। তুমি শরীরে কি এক রহস্য লুকিয়ে রেখেছ যা আমাকে এত উন্মনা করছে। আমি পাগলের মত আছি। কাছে কাছে থাকছি।

মাংস সেদ্ধ হলে লীনাকে বললাম, একটু খেয়ে দেখো।

লীনা বলল, আপনি খান। লীনা বাটিতে করে সামান্য মাংসের তুটো নরম পায়ের মাংস রেখে বলল, খেয়ে দেখুন ঝাল মশলা ঠিক হয়েছে কি না?

তুমি খেয়ে দেখ।

তবে আসুন তুজনেই খাই। বলে সে অন্য বাটিতে মাংস নিয়ে ফুঁ দিতে থাকল। তারপর আমার মাংসটাতে টুপি দিয়ে হাওয়া দিল। তুটো ঠাণ্ডা হলে বলল, খান।

আমি খুব আল্লা করে খেলাম।

লীনা বলল, পাখির মাংস মাত্রেই খুব নরম। সে জিভের ভিতর মাংসটাকে নিয়ে নাড়তে থাকল। ওর জিভ দেখতে পেলাম। হা করা মুখ দেখতে পেলাম—প্রায় এক আহারের সামিল, লালা দেখতে পেলাম জিভে—স্বাদু গন্ধে অতুলনীয়—সেই লালা যেন অপার্থিব জীবের, লালাতে জীবনের রহস্য ফুটে উঠতে চাইল—সেই এক লালা অথবা রস যা নিত্যদিনের অভ্যাসের সামিল, কোমল ত্বকের ভিতর

অতল জলের মত যা লুকিয়ে রাখতে পারলে যুবকেরা পাগল হয়ে যায়।

আমি সহ্য না করতে পেরে বললাম, তুমি তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। এত সময় নিয়ে খেলে দেখে ফেলতে পারে।

লীনা হাসল সামান্য। বলল, আমরা কি চুরি করে খাচ্ছি। আপনি এমন কথা বলেন না যে মনে হবে—

না আমি তা মনে করব কেন? এবার নিতাইকে ডাকলাম, দেখ ত নিতাই বাবুদের আর চা লাগবে কি না?

আর লাগবে না।

বার বার চা করতে পারব না। লীনা হাসতে হাসতে বলল, ওদের গলা পাওয়া যাচ্ছে। তাস খেলায় মসগুল। ওরা ওদের পয়েণ্ট নিয়ে চিৎকার, চেঁচামেচি করছে। লীনা নিতাইকে যেতে দিচ্ছে না।

আমি অগত্যা লীনাকে বললাম, তুমি তবে চাটনিটা বসিয়ে দাও।

খুব যে রাগ দেখছি।

রাগের কি দেখলে।

আচ্ছা সরলবাবু, এই বলে জলে টমেটো ধুতে ধুতে আবার বলল, আপনার একটা নিরুদ্দিষ্ট জাহাজের গল্প আছে না?

নিরুদ্দিষ্ট জাহাজের?

হ্যা সেই যে এক জাহাজ কেবল যায় যায়, বন্দর পায় না। নাবিকেরা বন্দর দেখার জন্য দূরবীণ নিয়ে বসে থাকে। কিন্তু হায় না বন্দর না কোন দ্বীপ—কেবল এক সাগর থেকে অন্য সাগরে জাহাজ ভেসে চলেছে। তারপর কি বন্দরটার নাম, সেখানে দুই পাখি—পাখির সঙ্গে বিশেষ করে মেয়ে পাখিটার সঙ্গে সব জাহাজীদের বন্ধুত্ব গড়ে উঠল।

আপনি দেখছি গল্পটা খুবই মনে রেখেছেন।

গল্পটা কি যে ভাল লেগেছিল না।

কেন এত ভাল লাগল বলুন ত ?

তেমন বন্ধুত্ব হয় না আপনার আমার সঙ্গে ?

আমি প্রায় জলে ডুবে গেলাম। সে কি তবে আমার ইচ্ছাটা ধরে ফেলেছে। বলি, আমরা ত সকলেই এখানে বন্ধুর মত।

আমি তাই ভাবছিলাম। বলে লীনা কেমন চুপ মেরে গেল।

কড়াইয়ে টমেটো সেদ্ধ হচ্ছে। গুড় এবং টমেটোর রসের জন্য ঝোলটা তামাটে রঙ ধরেছে। অথবা মনে হয় তামা রঙের লাভা সেই কড়াইয়ে ফুটছে। সেদিকে কি ভেবে লীনা অপলক এখনও তাকিয়ে আছে। ওকে অন্যমনস্ক করার জন্য বললাম, কি ভাবছিলে বললে না ত।

ভাবছিলাম পরস্পর আমরা কত সহজে নিকট আত্মীয়ের মত হয়ে যাই।

কোন উত্তর না দিয়ে কাছে গিয়ে বসলাম। লীনা ওর কাপড় সামলে নিল। পর্দার অন্যপাশ থেকে কেতকী এসে হাজির। সে বলল, আমরা সব দেখে ফেলেছি।

লীনা বিস্মিত মুখে বলল, কি দেখে ফেললে !

মাংস তোমায় সরলবাবু রেধে দিয়েছেন।

তাতে কি হল ! না হয় দিয়েছেন। যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল লীনার।

তাই এত অহঙ্কার। আমাকে শীলা বলল, রান্না খাওয়া যাবে না। চা বিস্কুট খেয়ে পেট ভরে নাও। অগত্যা তাতেও না হলে টুরিষ্ট লজে ভুরি ভোজন করা যাবে।

শুভেন্দু ছুটে এল। বলল, রান্নার কতদূর ?

আপনারা স্নান করে নিন। লীনা রান্না প্রায় শেষ করে এনেছে।

আমরা সকলে ফের টুরিষ্ট লজটাতে টিকিট কেটে উঠে গেলাম। নিতাই পাহারায় থাকল। সকলে স্নান সেরে নিল। এ-সময় লীনা

একটু প্রসাধন করল। শীলা সামান্য পাউডার পাফে বুলিয়ে গালে মুখে মেখেছে। একমাত্র কেতকী যতটা পারল উগ্রগন্ধ মেখে বের হয়ে সহাস্যে বলল, দিনটা বেশ আমাদের কেটে যাচ্ছে। কেমন দেখুন চারিদিকে কত বড় মাঠ, কত ফুল পাখি দেখুন।

শুভেন্দু বলল, হয়েছে বাবা কবিত্ব আর করতে হবে না। এবার চল লক্ষ্মী মেয়েটির মত সকলে একসঙ্গে খেয়ে নি।

কেতকী একটু ঠেস দিল কথায়, আমরা বললে কবিত্ব হয়। আপনারা করলে নাটক হয়। সরলবাবু বললে, গল্প উপন্যাস হয়।

কেতকীর দিকে তাকিয়ে বললাম, আমি সামান্য মানুষ, এর মধ্যে আমাকে কেন আর টানছেন।

লীনা বলল, আপনি চুলটা আচড়ে নিন সরলবাবু। বলে লীনা ব্যাগ থেকে একটা মিহি চিরুণী বের করে দিল। তারপর কাছে এসে বলল, ঘরের মানুষটি আপনার কেমন?

কেন এ-কথা বলত!

নিচের দিকটায় জামার একটা বোতাম নেই।

আমি বুকে হাত দিলাম। চারটা বোতামের ঘর। তিনটাতে বোতাম আছে। নিচের বোতামটা পড়ে গেছে কোথাও।

নিয়তির সম্মান বাচানোর জন্য বললাম, বোধহয় এখানে বোতামটা ছিড়ে পড়ে গেছে।

লীনাই সকলকে খেতে দিল। ঝুড়ি থেকে সন্দেশ এবং কমলা বের করে রাখল থালায়। কলাপাতায় জল ঢেলে দিল সামান্য। পাতা ভাল করে ধুয়ে নিলাম। চারপাশে আমাদের নারকেল গাছ। রেডিওতে কোন ধর্মীয় সঙ্গীত হচ্ছে। জল এবং লেবু সব যত্ন করে তুলে দিল লীনা। নিতাই ভাত দিল। সাদা ভাত শেষ পর্যন্ত করা হয়েছে। একটু মুগের ডাল, বেগুন ভাজা। তারপরই মাংসের ডেকচিটা লীনা তুলে এনে শুভেন্দুর সামনে ঢাকনা খুলতেই শুভেন্দু প্রায় হৈ-চৈ বাধিয়ে দিল, গ্র্যাণ্ড। মাইরী কি গন্ধ। সে

ছুবার নাক টেনে বলল, এই গন্ধেতেই গোটা ভাত লীনা খেয়ে নিতে পারি।

হয়েছে আর তামাসা করতে হবে না। বলে লীনা ছু'হাতা মাংস তুলে দিল। বলল, খান পরে আবার দিচ্ছি।

শীলা এবং কেতকীকে দিয়ে মণির সামনে দাঁড়ালে আমি বললাম, মণিকে দেখে শুনে দেবে। ও কিন্তু খেতে লজ্জা পায়।

হ্যাঁ সরল তুমি না আসতে চাইছিলে না! সকলে অপরিচিত, কোথায় যাব। ঠিক জমবে না। কত তখন অজুহাত দেখালে। যে তোমার হোষ্ট তাকে তুমি এখন পাত্তাই দিচ্ছ না। বলে সে শীলার দিকে তাকাল।

শীলা আপন মনে খাচ্ছিল। খুবই সুস্বাদু খেতে। মাংসের স্বাদ এবং গন্ধ জিহ্বায় লেগে থাকার মত। রস চুষে নেবার শব্দ উঠছে শুভেন্দুর জিভে। কেতকী খুব অল্প অল্প খাচ্ছে। মাংস যেন জিভে লাগছে না, সে কোন শব্দ না করে গিলে ফেলতে চাইছিল।

লীনাকে বললাম, আমাকে খুব সামান্য দেবে।

বারে এত কষ্ট করে রাঁধলেন।

আমারও তোমার মত। কাচা মাংস ঘাটলে রান্নার মাংস খেতে পারি না।

লীনা তবুও ছুহাতা মাংস দিয়ে বলল, না খেলে ভীষণ কষ্ট পাব।

আমরা না খেলে কষ্ট পাবে না, শুভেন্দু ঠাট্টা করল।

আপনারা না খেয়ে থাকছেন কোথায়? বলে লীনা ডেকচি থেকে অনেকটা মাংস দিয়ে দিলে শুভেন্দু বলে উঠল, আরে করছ কি! তোমার জন্য রাখবে। নীতাইর জন্য রাখবে।

কে খাবে এত বলুন ত। বলে সে ডেকচিটা শুভেন্দুর মুখের কাছে তুলে ধরল।

মণিকে ঢেলে দাও। কেতকীকে দাও। শীলা তুমি আর নেবে না? খুব যে চুপচাপ গিলছ।

শীলা বলল, খাও ত। খেতে বসে বক বক ভাল লাগে না।

লীনা আমাদের সন্দেশ দিল, দই দিল, তারপর খাওয়া হয়ে গেলে কমলা দিল আস্ত। যেন খেয়ে হাতমুখ ধুয়ে নিরিবিলি এই ফল ঘাসের উপর বসে খাই।

এবারে তুমি খেতে বস। আমরা তোমাকে দিই।

সে আমার কথার উত্তর দিল না। রেকাবীতে একটু দই সন্দেশ নিয়ে বসে গেল। সে বোধহয় মাংস খাবে না ভাতও খাবে না—সে বসে গেল রেকাবী নিয়ে। আমি বললাম, তুমি ভাত নাও। মাংস নাও।

সরলবাবু আমি আর খেতে পারছি না।

শুভেন্দুকে ডেকে বললাম, ছ্যাখ কি হচ্ছে এখানে।

সে এসে দাঁড়াল সামনে। বলল, কি হচ্ছে?

ভাত মাংস কিছু খাচ্ছে না।

শীলা এল, কেতকী এল। তারাও বলল, এই এটা কি করছিস।

আমার ভাই খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। গা গুলোচ্ছে।

শুভেন্দু বলল, তোমারা যে কি হয়েছে আজকাল। একটু পরিশ্রম করলেই আর দাঁড়াতে পার না।

না তা ঠিক না।

ছ্যাখো লীনা, মণি এবার শাসাল।

লীনা বলল, আমার ভাল লাগছে না। তাড়াতাড়ি এখন কোন-রকমে টুরিষ্ট লজে উঠে যেতে পারলে বাঁচি।

ঘড়ি দেখে বললাম, জোয়ার তোমার আসতে এখনও প্রায় পয়ত্রিশ মিনিটের মত। জোয়ার এলে জাহাজ ছাড়বে। তারপর কোথায় কোন জাহাজ আছে কে জানে। তুমি খাও ত। বরং দূরবীণটা দাও আমি ঢিবিটার উপরে গিয়ে বসে পাহারা দিই। জাহাজ উঠে আসছে কিনা দেখি।

কতকটা নিশ্চিন্ত হল লীনা। সে দূরবীণটা আমার কাছে গচ্ছিত রেখে খেতে বসে গেল। হেঁটে হেঁটে চলে এলাম নদীর পাড়ে।

তারপর ঢিবির উপর বসে চোখে দূরবীণ দিতেই মনে হল নদীর ওপারে শান্ত নিরিবিলি এক গ্রাম। গ্রামের অস্পষ্ট ঘর বাড়ি দেখা যাচ্ছে। কিছু পাখি উড়ছিল নদীতে। দূরে কোন জাহাজ উঠে আসছে না এখনও। সুতরাং বসে বসে পাখি দেখতে থাকলাম। আর পাখি দেখার সময় মনে হল সেই যুবতী মেয়ের মনে কি এক উদবিঘ্ন চিন্তা অথবা ভালবাসার ঘরে বাঁধা হয়ে গেলে মনের মানুষটি মনের ভিতরে বারে বারে ফিরে আসে। প্রিয়জন ঘরে ফেরার কি এক সরল আকুতি দেখতে পেলাম লীনার চোখে মুখে! সে দুটো নিশ্চিন্তে খেতে পারছিল না পর্যন্ত। তার মানুষ সফর করে ফিরছে। সে যেন কতকাল আগে মানুষটিকে বন্দরে ছেড়ে দিয়ে এসেছিল, সে মানুষ আজ হোক কাল হোক ফিরছে। কোন জোয়ারে জাহাজ উঠে আসবে কেউ বলতে পারে না। শুধু প্রতীক্ষায় বসে থাকা। লীনা নিশ্চয়ই আমার উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্তে খেতে পারছে। মনটা এক অজ্ঞাত সুখে ভরে যেতে থাকল।

কতক্ষণ একভাবে দূরবীণ চোখে দিয়ে বসেছিলাম মনে নেই। হুঁস হল আঁচলটা উড়ে এসে মুখে পড়তেই।

কি খাওয়া হল?

দেখতে পাচ্ছেন কিছু।

না।

জোয়ার এসে গেল অথচ—

পেট ভরে খেয়েছ ত?

খুব বেশি খাওয়া হয়ে গেলে। বলে পাশে হাঁটু মুড়ে বসল।

নাও এবার তোমার জিনিস তুমি নাও। বলে দূরবীণটা ওর হাতে দিলাম। সে চোখে দূরবীণ এঁটে উঠে দাঁড়াল। সে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দূরবীণে এখন দূরের নদী এবং মোহনার দিকে তাকিয়ে আছে।

সূর্য হেলে পড়েছে। ঠাণ্ডা হাওয়া উঠে আসছে নদী থেকে।

আকাশে কোন মালিন্য নেই। মণি শীলা এবং শুভেন্দু টুরিষ্ট লজটার দিকে হেঁটে যাচ্ছে। তালপাতার টুপি মাথায় একটা বাচ্চা আমাদের দিকে এসে ফ্যাল ফ্যাল করে লীনাকে দেখতে থাকল।

ওরা টুরিষ্ট লজে উঠে গেল! আমি বললাম।

ওরা এখন সোফাতে গড়াগড়ি যাবে। লীনা জবাব দিল।

তুমিও একটু বিশ্রাম নিলে পারতে। মেয়েদের দিবা নিদ্রার অভ্যাস আছে জানি। অভ্যাসে ব্যাঘাত ঘটলে শরীর খারাপ করতে পারে।

লীনা দূরবীণ চোখ থেকে কিছুতেই নামাচ্ছে না। চোখে রেখেই বলছে, ওসব অভ্যেস টভ্যেস আমার নেই।

লজে উঠে গেলে হত না! সেখানে বেশ আরামে দাঁড়িয়ে দেখা যেত।

এখানে খারাপ কি। বেশ ত দেখা যাচ্ছে। বলে লীনা সেই বাচ্চাটার চোখে একবার দূরবীণের কাঁচ ছুঁইয়ে দিল। বোধহয় ভয় পেয়ে সে তড় তড় করে নিচে নেমে যাচ্ছে। আমি বললাম, লীনা আজ যদি না আসে?

কাল আবার গাড়ি চালিয়ে চলে আসব।

মাঝে মাঝেই তবে চলে আসা হয় এখানে।

ওর আসার কথা থাকলে…

সব চেনা জানা তোমার তবে মনে হয়।

লীনা খুব সতর্ক নজরে দেখছে। সে এত নিবিষ্ট যে উত্তর দিতে পারল না পর্যন্ত।

বললাম, যদি রাতের জোয়ারে জাহাজ উঠে আসে?

ভোর হলে তবে ওকে বাড়িতেই দেখতে পাব।

কেন, শীলা যে বলল তুমি রাতেওছু একবার এখানে এসে থেকেছ?

থেকেছি। রাতে মানুষটা লাল নীল সিগনাল দেয় আমাকে। আমি বুঝতে পারি সে জাহাজে আছে।

তুমি বুঝতে পার তোমার প্রিয় মানুষটি জাহাজে রয়েছে। তখন তোমার মনে হয় না—এই মানুষের জন্য কতকাল প্রতীক্ষায় আছ—এই মানুষ আবার দু দিন বাদে সমুদ্রে চলে যাবে।

তখন আমার কিছুই মনে থাকে না সরলবাবু। মাঝে মাঝে আপনার গল্পের নায়ক মৈত্রের কথা মনে হয়। যে বৌ রেখে জাহাজে চলে যেত আর বন্দর থেকে একমাত্র চিঠি স্ত্রীকে—শেফালী এই আমার শেষ সফর। সমুদ্রে আর আসছি না। আমি সফরে সফরে টাকা জমাচ্ছি। ঘরে ফিরে ব্যবসা করব—নতুবা কিনারায় কোন কাজ দেখে নেব। বলে সে আমার পাশে বসে পড়ল, তারপর সে আপন মনে বলল, কিন্তু ঘরে ফিরে বড় জোর দু'মাস। তারপর ফের মৈত্র লোনা জলের টানে বিষণ্ণ হয়ে পড়ত।

তুমি তবে আমার একনিষ্ঠ পাঠক। এক এক করে দেখছি সব গল্পের নাম করে দিচ্ছ।

লীনা দূরবীণটা চোখ থেকে তুলে নিল। আমার দিকে অপলক তাকিয়ে বলল, আপনার গল্পে আছে না এক জাহাজী সারাদিন বন্দরে নামতে পারল না, ভীষণ তুষার ঝড়। সে এবং তার এল্যান তুষার ঝড়ের ভিতরই এক বিকেলে বন্দরে মেয়ে ধরবার জন্য নেমে গেল। কি আপনার মনে পড়ছে? জাহাজীর নাম অবনীভূষণ।

মনে পড়ছে।

যাবার সময় দেখল সেকেণ্ড অফিসার কোত্থেকে একটা মেয়ে জোগাড় করে এনেছে। কি ঠিক বলছি?

ঠিক বলছ।

ওরা কিন্তু বন্দরে কোন যুবতী ধরতে পারল না। সেই মারামারির দৃশ্যটা। এক আগুনকে ঘিরে তিন চারজন যুবতী বসে ছিল—ওরা টানাটানি করতে গিয়ে হাতাহাতি। সারারাত ঘুরেও বন্দরে কোন যুবতী ধরতে পারল না।

মনে পড়ছে।

তারপর কিন্তু অবনীভূষণ জাহাজে ফিরে তার কেবিনেই এক যুবতীকে দেখতে পেল।

গল্পের নাম 'মানুষের ধর্ম।' আমি সায় দিলাম।

সেকেণ্ড অফিসার ওকে কামড়ে খামচে ওর আর কিছু রাখেনি। যুবতী প্রাণ বাঁচানোর দায়ে অবনীভূষণের কেবিনে দরজা বন্ধ করে আত্মরক্ষা করছিল। মদে মাতাল হয়ে অবনীভূষণ টলছিল। সে লাথি মেরে দরজা খুলতেই ঘরে প্রজাপতির মত···বলে বাকিটুকুতে ড্যাস ব্যবহার করল লীনা।

প্রজাপতির মত উলঙ্গ এক নারী সে বলতে পারত। সে ইচ্ছা করে বলল—সেই শেষ দৃশ্যটা ভুলবার নয়। যেখানে যুবতী ভয়ে অবনীভূষণকে কামড়াতে আসছে। আমি আপনার গল্পের শেষ কটা লাইন মুখস্ত বলে দিতে পারি। প্রায় ধর্মযাজকের মত সেখানে অবনীভূষণ তুষার ঝড়ের ভিতর দরজায় বসে পাহারা দিচ্ছিল—আপনার মনে পড়ছে লাইন কটা?

মনে পড়ছে না।

দেখুন ত মনে করতে পারেন কিনা বলে প্রায় নিজে সে আবৃত্তি করে শোনাল, অবনীভূষণের মনে হল দীর্ঘ দিন পর সে এক অসামান্য কাজ করে ফেলেছে। সে বলল, আমি বাইরে বসে থাকছি। আপনি ভিতরে নির্ভয়ে ঘুমোন। বলে, অবনীভূষণ দরজা বাইরে থেকে টেনে বন্ধ করে দিল এবং ঠিক দরজার সামনে ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডার ভিতর পা মুড়ে বসে থাকল এবং জেগে জেগে এক বিস্ময়কর স্বপ্ন দেখল—দ্বীপের স্বপ্ন, বড় এক বাতি ঘর দ্বীপে—সব বড় বড় জাহাজ সমুদ্রগামী—জাহাজের মাস্তুলে সে মানুষের ধর্ম বড় বড় হরফে এই শব্দ ঝুলতে দেখল। অবনীভূষণ নিঃশব্দে হাঁটু মুড়ে মাথা গুঁজে বসে থাকল—তার এতটুকু নড়তে ইচ্ছা হচ্ছিল না, যেন জীবনে সাত রাজার ধন এক মানিক খুবই হাতের কাছে রয়েছে তাকে গলা টিপে মারতে নেই। সুতরাং সে উঠল না এবং এই দুঃখকর রাত্রি জীবনের

প্রথম আলোর পথ বলে মনে হল অবনীভূষণের। লীনা আবৃত্তি শেষ করে বলল, কি মনে পড়ছে মশাই। লেখেন আপনি, আর মনে রাখতে হয় আমাদের।

তাই তো দেখছি।

তারপরই সেই অবনীভূষণকে আমি মনে মনে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। এক পার্টিতে আমার দেখা হয়ে গেল তার সঙ্গে। লম্বা উঁচু মানুষ। কেবল পাইপ টানে। নেভির পোষাক ছিল ওর গায়ে। কালো টুপিতে একটা জাহাজের নোঙর চক চক করছিল। সোনালী রঙের ষ্ট্রাইপ দুটো কাঁধে এবং হাতে ঝুলছে। সে সেই পার্টির বুঝি মধ্যমণি। ওর আকর্ষণ আমাকে পাগল করে দিয়েছিল।

আমার বলার ইচ্ছা হল—যুবতী তুমি অবনীভূষণকে খুঁজে বেড়াও নি। তুমি আমাকে খুঁজছিলে। কারণ অবনীভূষণ আমার চরিত্র, আমার তৈরী চরিত্র। আমি যেমন চরিত্র ভালবাসি অথবা বলতে পার আমি যে চরিত্রে অবনীভূষণকে চেয়েছি তেমন এক চরিত্রে হাজির করেছিলাম। তুমি তাকে ভালবেসে ফেলেছিলে।

সূর্য ক্রমে নিচে নেমে যাচ্ছিল। আমি ওপারের অস্পষ্ট ছায়া ছায়া গ্রামের ভিতর বোধহয় কিছু খুঁজে মরছিলাম, বোধহয় আমার মনের ভিতরে সেই দাবানল অজ্ঞাতে জ্বলতে আরম্ভ করে দিয়েছে। কারণ জ্বর জ্বর লাগছিল। চোখ জ্বলছিল। পাশে এমন এক মনোরম শীতের বিকেলে সুপুষ্ট বাহু লীনার এবং ঘাড় গলা এত মসৃণ যে কিছুতেই স্থির থাকা যাচ্ছিল না। আমি শক্ত হয়ে বসে থাকলাম। বলার ইচ্ছা হচ্ছিল—যুবতী সেই সন্ধ্যায় তুমি আমাকে দেখলেও ক্ষেপে যেতে। কারণ আমিই তোমার মনের মানুষ ছিলাম। মনে মনে তুমি আমাকেই খুঁজছিলে।

কি কোন কথা বলছেন না কেন ?

তোমার জাহাজ উঠে আসছে ?

দুটো জাহাজ দেখতে পাচ্ছি।

ত্যাখো।

জাহাজ তুটো উঠে এল এবং আমাদের সামনে দিয়ে চলেও গেল। কোম্পানীর নাম আমি চিমনি দেখে চিনে ফেলেছিলাম। লীনাও চিমনি দেখে হতাশ হয়েছে। কারণ এই জাহাজ অন্য কোম্পানীর। লীনা বলল, বোধহয় আজও এল না।

তা হলে ওঠা যাক। এই বলে উঠতে চাইলে বলল, সরলবাবু আজও আমি না ঘুমিয়ে থাকব।

কেন? কোন কষ্ট হয় তোমার?

ভীষণ কষ্ট হয়। কেমন বালিকা সুলভ আবেগে সে সব কথা বলে যাচ্ছিল।

যুবতী তোমার কিসের কষ্ট। প্রেমের না সহবাসের। আমার এমন সব কথা বলার ইচ্ছা হচ্ছিল। শুয়ে শুয়ে রাত জাগা---সে কি কষ্টের আমি জানি, বলার ইচ্ছা হচ্ছিল। তবু বললাম, চল দেখি ওরা কি করছে। কখন যাবে তাও দেখতে হয়।

সে উঠতে চাইল না। আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম। সে আমার হাতে হাত রাখল না পর্যন্ত। তারপর কাছে গিয়ে তুই হাতে ওকে জাপটে ধরলাম, ওঠ।

কেমন পুতুলের মত সে উঠে দাঁড়াল। সে চলতে পারছে না। তার হাঁটু ভেঙ্গে আসছে। বললাম, কি হল তোমার?

ভাল লাগছে না।

বুঝি সেই জ্বরটা ওরও এসে যাচ্ছে। ওর কপাল ঘামছিল, হাত পা কাঁপছিল। এমন পুষ্ট শরীর বুঝি এক্ষুনি গলে যাবে।

এই লীনা কি হচ্ছে?

লীনা জবাব দিল না। সে আগে আগে হাঁটতে থাকল। মনে হয় আমার সঙ্গে ওর কোন পরিচয় নেই। মনে হয় সে বড় একা এবং নিসঙ্গ। সে এত জোরে হাঁটতে লাগল যে প্রায় দৌড়াবার মত।

পিছন থেকে চিৎকার করে ডাকলাম, লীনা অত জোরে হাঁটলে আমি অনেক পিছনে পড়ে থাকব।

লীনার কোমল শরীরে তেমনি লাবণ্য ঝড়ে পড়ছিল। তেমনি ঠাণ্ডা বাতাস উঠে আসছে। এবং আমার শীত শীত করতে থাকল।

টুরিষ্ট লজের বারান্দা থেকে শীলা বলল, কিরে তোদের আবিস্কার কতটুকু ?

লীনার হয়ে আমিই জবাব দিলাম, সামান্য।

ওর মনের মানুষটি হাত নাড়ল ? শুভেন্দু পেছন থেকে বলল।

তখন দেখলাম পশ্চিমের একটা হাল্কা মেঘ ক্রমশঃ সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলছে। সূর্য অস্ত যাচ্ছে অন্য পারে। যারা সহর থেকে এসেছে তারা ক্রমে ক্রমে মাঠ খালি করে চলে যাচ্ছে। লীনা এখন ঘরের ভিতর। জাহাজের মাস্তুল ক্রমে হারিয়ে গেল। এখন ইতস্তত নদীতে দুটো চারটা নৌকা ভাসছে। জাহাজ নোঙর তোলবার সময় যেমন শব্দ হয় তেমন একটা শব্দ আমরা আকাশের অন্য প্রান্তে শুনতে পেলাম।

কেতকী বলল, চল এবার গ্রামটা ঘুরে ফিরে দেখে আসি।

শুভেন্দু বলল, সন্ধ্যা হলে রওনা হব।

শীলা বলল, এত তাড়াতাড়ি। আপনার কি মত ! শীলা আমার দিকে তাকাল।

এমন একটা শীতের সন্ধ্যা অথবা রাত আমার জীবনে কতদিন পর যেন এসেছে। যতক্ষণ আরও থাকা যায়। লীনা আমাকে সামান্য আপনজনের মহিমার স্পর্শ দিয়েছে। আমার কেন জানি লীনাকে কেন্দ্র করে কেবল ঘুর ঘুর করতে ইচ্ছা হচ্ছিল। এই বারান্দায় লীনা এসে বসুক, আমার সঙ্গে গল্প করুক এবং ছুটে বেড়াক ছাদময় অথবা রেলীঙে ঝুকে বলুক, আমি মরে গেলে আপনার কষ্ট হবে না সরলবাবু, আমি মরে যাই ? শীলাকে বললাম, আর একটু বসি না ?

সহরে ফিরে গেলে আবার ত সেই ইঁট কাঠ মানুষজন আর গাড়িঘোড়ার কলরব।

ঠিক হল রাতে খাবারটা আমরা লজেই সেরে নেব। সেমত ম্যানেজারকে বলেও দেওয়া হল। তিনি আমাদের কোন অসুবিধা হবে না জানালেন।

মণি বলল, তবে ভাই আমি একটু ঘুরে আসি।

কোথায় যাবে? শীলা বলল।

আর কোথায়? কিন্তু মাতলামী করলে ভাল হবে না মণি। শুভেন্দু মণিকে শাসাল।

আরে না। একটু ঘুরেই চলে আসব।

কেতকী ছাদের উপর পায়চারি করতে করতে বলল, এমন দিনে তারে যায় না ফেলা। একটু হলে মন্দ হয় না।

মণি বলল, তোমার দেশী লিকার চলে।

সব চলে। হলেই হল।

কি আমার বিলেতি খাবার লোকরে! এই বলে মণি নেমে গেলে শুভেন্দু বললে, বেশ হয়। কতদিন ত একটু খোলামেলা গান গেয়ে বেড়ানো হয় না। সে উপর থেকে চিৎকার করে বলল, আনবি। বেশি করে আনবি। কি শীলা চলবে?

তুমি কিগো। আমি কবে খেয়েছি এসব ছাই পাশ।

লীনা, লীনার চলবে না। এই বলে শুভেন্দু লীনাকে খুঁজতে চলে গেল। শুভেন্দুর এই আচরণে বিস্মিত হলাম। মণির প্রথম প্রস্তাবে সেই ক্ষেপে গিয়েছিল আর এখন ওর প্রায় যেন কর্তব্যের সামিল—সকলকে সামান্য কিছু খাওয়ানো, পিকনিকের প্রায় ষোল আনা তবে উশুল হয়ে যাবে। সে রা রা করে করিডোরে গান গাইতে থাকল।

আমি রেলিঙে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখছিলাম। ধীরে ধীরে সূর্য নদীর ওপারে অস্ত গেল। ক্রমে গাঢ় লাল রঙ নদীর পারে নেমে আসতে

থাকল। যে সব পাখিরা ভোরের দিকে সমুদ্রে চলে গিয়েছিল ক্রমে তারা উড়ে উড়ে নদীর অন্য পারে গাছগাছালির ভিতর হারিয়ে গেল।

ড্রাইভার এলে শুভেন্দু বলল, তোমরা বাসে চলে যাও। তুমি এবং নিতাই। আমাদের ফিরতে একটু রাত হবে। বাড়িতে খবর দিয়ে দিও। মা যেন চিন্তা না করেন।

ড্রাইভার! রেলিঙ থেকে আমি ডাকলাম ওকে। যাবার পথে তুমি একটু আমার বাসায় খবর দেবে। রাতে আমি খাব না। ফিরতে একটু রাত হবে মোটামুটি এ সব খবর দেবার পর আমার মনে হল লীনা হলটার ভিতরে নেই। কাঁচের ভিতরে সৌখীন আলো জলছে। যতটা ঠাণ্ডা পড়বে আশা করা গিয়েছিল তেমন ঠাণ্ডা আদৌ পড়েনি। ভিতরের জ্বালা জ্বালা ভাবটা কেবল বাড়ছে। হাত পা খুব ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে এবং হাত পা আমার ঘামছিল কেবল। আমি লীনাকে হল ঘরের ভিতর না দেখতে পেয়ে করিডোরে ঢুকে ডাকলাম, লীনা, লীনা তুমি কোথায়? বাইরে এসে শুভেন্দুকে বললাম, লীনাকে দেখছি না? লীনা কি নীচে নেমে গেছে?

না ত। আমিও খুঁজলাম। কোথায় গেল।

শীলার দিকে তাকাতেই সে চোখ টিপে হাসল। এবং বলল, লীনার জন্য অত চিন্তা করতে হবেনা সরলবাবু। সে ঠিকই আছে।

শীলার এমন কথায় একটু বিব্রত বোধ করাল। সমস্ত দিনের আচরণে লীনার প্রতি আমার কোন দুর্বলতা হয়ত ওদের চোখে ধরা পড়েছে। ওরা ভিতরে ভিতরে হাসাহাসি করছে হয়ত। সুতরাং লীনার কাছ থেকে দূরে থাকা ভাল। বয়সটা এখন আর ছেলেমানুষী করার নয়। আবেগ এবং ধর্মীয়বোধ দুই সমান ভেবে উত্তরের দিকের করিডোরে দাঁড়িয়ে দূরের রেল লাইন ঝিল দেখার চেষ্টা করলে শুধু এক গাঢ় অন্ধকার দেখতে পেলাম। কি করে যেন মুহূর্তে স্ত্রীর মুখ ভুলে গেছি। আমার প্রিয়জন আছে, সংসার আছে, আমার প্রাণের চেয়ে দুর্লভ বুনো আছে। তাদের মুখ কেমন ফ্যাকাশে

দেখাচ্ছে। তাদের মুখ অন্ধকারের ভিতর হারিয়ে গিয়ে সেই এক বন্দর যেন সামনে, বন্দরে কত সব পাইন গাছ, বন্দরে কত সব বিচিত্র ফুলের সমারোহ—আমি সরল সেই সমারোহের ভিতর শিস দিয়ে হাঁটছি যুবতী সন্ধানে। আমার ভিতরে আমি এক অসহায় আর্তনাদে ডুবে যাচ্ছিলাম। লীনা আমার কাছে ক্রমে দুর্লভ বস্তুর মত, ক্রমে লীনা আমাকে গ্রাস করে ফেলছে।

এই সন্ধ্যায় যতটা হাসব গাইব খেলব ভেবেছিলাম শীলার একটা কথাতে কেমন সহসা উবে গেল সব। লীনাকে খুঁজতে পর্যন্ত সাহস পাচ্ছি না। সে গেল কোথায়! সে কি কোথাও দূরবীণ চোখে দিয়ে বসে আছে। বস্তুত আমার কিছুই ভাল লাগছিল না। লীনা থাকলে আমার আপনজন থাকার মত—অথচ শীলা ওরা কি ফিস ফিস করে বলছে কাউকে আর অনুসন্ধান করা যাচ্ছে না। ছাদের উপর শীলা এবং কেতকী দুটো চেয়ার এনে বসল। নিচে নদী। নদীর জল ক্রমে গাঢ় অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। দুটো একটা নৌকা, নৌকায় লণ্ঠন জ্বলছে। কিছু জেলে নৌকা—মোহনায় মাছ ধরার জন্য নেমে যাচ্ছে। একটা লঞ্চ মাঝ নদীতে। আমি একা। এমন কি শুভেন্দু মণির সঙ্গে বাজারে চলে গেছে। সে মণিকে বিশ্বাস করতে পারেনি। কারণ মণি মদ পেলে বাজার থেকেই খুলে খেতে আরম্ভ করবে।

শুভেন্দু জানত এখানে কারা চুরি করে ভাল মদ বিক্রি করে। সে মণিকে নিয়ে সেদিকে ছুটে বের হয়ে গেল। আমি খুব একা পড়ে গেলাম। ওদের সঙ্গে আমি গেলেও পারতাম। এখন এই দুই যুবতী, এবং অন্য যারা আছে তারা খুব কোলাহল করছে। কেতকী পর্যন্ত ইংরাজী গান গাইছে। আর শীলা ছোট ছোট চোখে আমাকে দেখছে।

আমি বলতে চাইলাম, শীলা তুমি আমার কি দেখছ? তুমিও কি আমার ভেতরের মানুষটির বদ মতলবের কথা ধরে ফেলেছ।

আমি নাচার। কোন এক অজ্ঞাত রহস্য আমাকে ক্রমশঃ পঙ্গু করে দিচ্ছে।

শীলা আমার পাশে এসে দাঁড়াল। এবং বলল, অত ভাববেন না!

ভাবছি কোথায়?

বাথরুমে গেছে।

শীলা এতটা বেহায়া হতে পারবে কথাবার্তায় আমার ধারণা ছিল না। শুভেন্দু চলে যেতেই কেমন গায়ে পড়া ভাব। শীলা পাশে দাঁড়িয়ে বলল, কি গিন্নির জন্য মন খারাপ করছে। বোধহয় কথাটা ঘোরাতে চাইল।

আপনারা থাকতে গিন্নির জন্য মন খারাপ করতে পারে!

তবে কি হল! বিকেল থেকে মুখ গোমড়া করে আছেন।

হা হা করে তবে আসুন হাসি এখন।

জোর করে কেউ হাসতে পারে!

তখন লীনা সাজগোজ করে এসে বারান্দায় দাঁড়াল। শীত পড়ার কথা। অথচ অবাক শীত পড়ছে না। বরং গরম গরম লাগছিল। বিকেলের যে ঠাণ্ডা ভাবটা ছিল কি কারণে সেই ঠাণ্ডাভাবটুকু পর্যন্ত সরে গেল?

কেতকী বলল, তোর জন্য সরলবাবু ত একেবারে পাগল।

লীনা বলল, তাই বুঝি? তুই কার জন্য পাগল?

আমার আবার কে আছে।

ভাই কি হচ্ছে! চোখ বড় বড় করে ধমক দিল শীলা।

আমার পিছনে লাগছে কেন?

সব এখানে এসে কচি খুকি বনে গেছে। শীলা না বলে পারল না।

তখন আকাশে বড় চাঁদ উঠে এসেছে। পূব দিকটা লাল ছিল। চাঁদের আলো বড় মায়াময়। এই দেখে এবং ওদের কথাবার্তায় রহস্য

ধরতে পেরে বললাম, আসুন না এই জ্যোৎস্না রাতে ছাদের উপর প্রেম প্রেম খেলা করি।

কেতকী বলল, প্রেম প্রেম খেলা কি রকম।

অঃ তাও জানেন না! চম চমে জ্যোৎস্নায় বুকটা কিসের জন্য সহসা ছাৎ করে ওঠে না, সেই প্রেম, প্রেম প্রেম খেলা। একজন চোর হবে, বাকি সবে চোর ধরবে। প্রেম চোর ননী চোর, কত রকমের চোর আছে পৃথিবীতে।

কেতকী বলল, আপনি কোন জাতের?

খেলা আরম্ভ হলে টের পাবেন।

লীনা বলল, সরলবাবু চা খাবেন? একটু চা দিতে বলি।

বোধহয় লীনা আমার এমন সব কথাবার্তা পছন্দ করছিল না। সে অন্য কথায় নিয়ে এল। রাত বাড়ছে। ওরা এখনও আসছে না। আমবা গোল হয়ে বসে আছি। চা দিয়ে গেছে বয়। এরপর আমরা এখানে বসে সামান্য পাণীয় খাব। বেশ জমবে ভাল।

লীনাকে উদ্দেশ্য করে বললাম, তোমার এসবে আশক্তি আছে।

আমি খাই না সরলবাবু। খেতে আমার ভাল লাগে না।

তোমার মানুষটি কিছু বলে না।

ওর খুব ইচ্ছে আমি খাই। মাঝে মাঝে জোর করে, না খেলে রাগ করে। অনুরোধে উপরোধে ঢেকি গেলা আর কি।

আজ খাবে না?

সকলে খেলে…।

শুভেন্দু এল, মণি এল। ওরা গ্লাস গাড়ি থেকে তুলে এনেছে। লজে খাবার নিয়ম নেই। ম্যানেজারকে সামান্য ভেট পাঠিয়ে দিতে হল। বেশ নিরিবিলি ছাদের একটা কোণে বসে, জ্যোৎস্না রাতে নদীতে নৌকার বৈঠার ছপ ছপ শব্দ, দূরে কি এক অপরিচিত পাখি ডাকছিল—আমরা সহর ছেড়ে এসে সামান্য উচ্ছৃঙ্খল হবার বাসনায় মদের ভিতর ডুবে গেলাম। দৈনন্দিন একঘেয়ে জীবন থেকে সামান্য

মুক্তি খুঁজতে গিয়ে পরিমানে সকলেরই কমবেশি নেশা ধরে গেল। শুভেন্দু আমাদের চালক। সেই পরিমাণে বেশী গিলে ফেলে মাতলামী করতে থাকল।

মণিটা সামান্য খেলেই নাচতে আরম্ভ করে। সে বলল, অয়ি মা বসুন্ধরে আজ আমরা তোমার পুত্রবৎ।

লীনা কাছে এসে বলল, সরলবাবু এদের সামলানো দায় দেখছি।

শীলা চিন্তিত হয়ে পড়ল। সে খুব অল্প খেয়েছে। বলল, বলুন এখন কি করবেন। এ অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে যাওয়া খুব রিস্ক।

তবে থাকার ব্যবস্থা করতে হয়। বলে ম্যানেজারের ঘরে ঢুকে সব বললে, দুটো ঘর আমাদের থাকবার জন্য দেওয়া হল। লীনাকে ব খুখুশী দেখাচ্ছে। সে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছিল। সবার খাবার এবং দেখা শোনা সেই প্রায় করছিল। আমি কানের কাছে ফিস ফিস করে বললাম, কি ব্যাপার মনে হচ্ছে ঘরে নতুন বর আসবে!

আমরা সবাই সামান্য খাবার খেলাম। শুভেন্দু একেবারেই কিছু খেল না। মণি মুখে তুলে ফেলে দিল। জিভে স্বাদ ছিল না। কেতকী মুরগীর মাংস একটুকরো চিবিয়ে খেল আর আমি যৎ সামান্য ভোজনের পর সবাইকেই প্রায় অনুরোধ করলাম, ছাদের উপর শোবার আগে ফের একটু বসার জন্য।

শুভেন্দু এবং মণি প্রায় দাঁড়াতে পারছিল না। ওরা বসতে চাইল না। কেতকীকেও খুব ক্লান্ত লাগছে। শীলা বলল, শরীর আর দিচ্ছে না। বোধহয় শীলার দিবা নিদ্রার অভ্যাস আছে। আজ সেটুকু হয়নি। সেও শুয়ে পড়ার জন্য নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

লীনা একা বোধহয় আমার সঙ্গে ছাদের উপর বসে থাকতে সাহস পেল না। কারণ গ্রাম মাঠ চারপাশে। নদী সামনে, সেই মাঠ এবং ঢিবি দেখা যাচ্ছে। আর চারধারে কি অসামান্য জ্যোৎস্না! গাছ গাছালি সব সেই জ্যোৎস্নায় রহস্যময় নারীর মত যেন হাত তুলে আমাকে ডাকছে। লীনা কেতকী, শীলার সঙ্গে চলে গেল।

কেতকী শীলা লীনা একঘরে, আমরা তিনজন একঘরে কোনরকমে রাত কাটাবার কথা। লীনা যাবার আগে শুধু বলল, শুয়ে পড়ুন সরলবাবু। ছাদে বসে থাকলে ঠাণ্ডা লাগবে। এই বলে সে আর দাঁড়াল না।

ছাদের উপর লম্বা সোফাতে পা ছড়িয়ে বসলাম। এখন আর কেউ নেই। সারাটা দিন কি ভাবে কেটে গেল! মনেই হয়না আমার অন্য প্রিয়জন আছে। লীনা আমাকে ফেলে নিজের ঘরে শোবার জন্য চলে গেছে। লীনা একটু বসল না পর্যন্ত। ভিতরে ভিতরে কেমন এক আবেগ বিহ্বল অভিমানে কষ্ট পাচ্ছিলাম। কতকালের এক সংগোপন প্রেম আমি যেন লীনার জন্য সংরক্ষণ করে অসছি। আজ সহসা আবিষ্কার করে নিজের কাছে নিজেই কেমন বিব্রত বোধ করছি। বুঝি এই প্রেম আমি চিরকাল বহন করে যাব। আবার সেই অপরিচিত পাখির ডাক শুনতে পেলাম। পাখিটা করুণ স্বরে একটানা মাঠের ভিতর ডেকে চলেছে। আমার কেন জানি সেই পাখির ঘর আবিস্কার করার ইচ্ছা জাগল। অথবা মনে হল এমন জ্যোৎস্না আমি কোনদিন দেখিনি, এমন প্রিয় ভালবাসার মুখ কোনদিন দেখিনি, আমি কেমন লীনার জন্য বড় নিঃসঙ্গ বোধ করছি। বোধহয় চিন্তার ভিতর ডুবে গেছিলাম, বোধহয় সামান্য আলস্য এবং ঘুম এসে আমাকে নিরাময় করছিল এবং অকারণ এক নির্জন প্রান্তরে বার বার হেঁটে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে, স্বপ্নের ভিতর আমি যেন কার হাত ধরে বার বার সেই ঢিবিটার উপরে উঠে যাচ্ছি, ঢিবিটার চারপাশে আমাকে কেবল কে যেন ঘুরিয়ে মারছে। চোখ মুলতেই দেখি কেউ নেই, আমার মুখের উপর সামান্য এক শাড়ির আঁচল এসে পড়েছে। আমার পিছনে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। তাড়াতাড়ি ধড়ফড় করে উঠে বসলাম। বসতেই সেই যুবতী চাপা হাসিতে ফেটে পড়ল। সে সরে দাঁড়াল। তাকে ধরতে গেলাম সে সিঁড়ির দিকে নেমে গেল। আমি ডাকলাম, লীনা, লীনা কোথায় নেমে যাচ্ছ।

সে বলল, কি জ্যোৎস্না দেখেছ! বলে সে জ্যোৎস্নায় নদীর ঢালুতে নেমে গেল।

ছুটছিলাম। যাবার সময় দেখলাম দুই ঘর খোলা। ওরা পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। নিচে দারোয়ান ঘুমোচ্ছে। খুব সন্তর্পণে দরজা খুলে লীনা নদীর ঢালুতে নেমে হাত তুলে ডাকল, এখন আবার জোয়ার আসবে সরলবাবু। আবার জাহাজ উঠে আসবে।

আমি কোন কথা শুনতে পাচ্ছিলাম না। আদিগন্ত মাঠ সামনে। গ্রাম্য মাঠ, শুধু নৌকা থেকে জেলেদের ইতস্তত দুটো একটা কথা ভেসে আসছে। আমি ওকে ধরার জন্য ছুটছিলাম। সে ধরা পড়ার ভয়ে ছুটছিল। মাথায় সেই চাঁদের আলো মায়াময়। আমি ওকে ছুঁতে চাইছি, সে আমাকে খেলাতে চাইছে। সে এই মাঠ এবং ঝোপজঙ্গলের মধ্যে লুকোচুরি খেলতে চাইছে। আমি ডাকলাম, লীনা তুমি কোথায়, তুমি ভয় পাচ্ছ না! কোন জবাব পাওয়া গেল না। দূরে মরীচিকার মতো দেখা গেল হরিণীর মতো কেউ কেবল কোথায় ছুটে যেতে চাইছে। আমি জোরে চিৎকার করে বললাম, লীনা তুমি কি চাও! লীনা তেমনি নিরুত্তর। মাথার ওপর সেই আকাশ এবং নক্ষত্রমালা, নদীর কলকল ছলছল শব্দ। আবার ডাকলাম, লীনা তুমি কি অস্থি মজ্জায় অস্থির হয়ে উঠেছ। স্থির থাকতে পারছ না। আমাকে তুমি আর কতদূর নিয়ে যেতে চাও! না তখনও কেউ আমাকে কোন জবাব দিচ্ছে না। শুধু সেই চিরন্তন বায়ুপ্রবাহ বয়ে আসছে সমুদ্র থেকে। বাতাসে সমুদ্রের গন্ধ। এবং যুবতীর শরীরেরও আশ্চর্য এক সমুদ্রের গন্ধ টের পাচ্ছিলাম। আমিও আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না, ছুটতে থাকলাম। সেই সুমধুর সমুদ্র এবং তার গন্ধ আমাকে ধীরে ধীরে পাগল করে দিচ্ছে। এ-সময় এই বিশ্ব বলতে লীনা, বাতাস বলতে সমুদ্রের বাতাস, এবং নদী বলতে এক আবাহমান কালের ইচ্ছের কথাই মনে হচ্ছিল। আমার স্ত্রী এবং কন্যা অথবা আমার অন্য অস্তিত্ব ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছিল।

কিছুটা দূরে সামান্য একখণ্ড বালিয়াড়ি, কিছু ঝিনুক, এবং নদীর জল। বালিতে পায়ের ছাপ। পায়ের ছাপ দেখে ওকে এখন অনুসরণ করছি। জোয়ারের জল বালিয়াড়ি থেকে সরে গেছে বলে অন্য কোন দাগ পড়ে নেই। দেখে মনে হচ্ছে এক যুবতী পৃথিবীর নতুন খবরে উন্মাদ হয়ে গেছে। খবরটা বার বার হাজার বার অতীব নতুন বলে যুবতীর পায়ের ছাপেও যেন প্রচণ্ড অধীরতা রয়েছে। একটা জায়গায় এসে বালিয়াড়ি শেষ হয়ে গেল, ছাপও শেষ হয়ে গেল, ডাঙ্গার দিকে সে যদি উঠে গিয়ে থাকে। ঝোপজঙ্গলে সে যদি লুকিয়ে থাকে। না সে কোথাও নেই। কেমন ভয় ধরে গেল ফের চিৎকার করে বললাম, লীনা লীনা আমি ফিরে যাচ্ছি। সবাইকে খবরটা দেওয়া দরকার। নদীর জলে অথবা অন্য কোথাও তুমি হারিয়ে গেছ। আর ঠিক তখুনি পাশের ঝোপ থেকে লীনা আশ্চর্য অধীরভাবে বলল, আমি এখানে। এত ভয় পাচ্ছেন কেন?

কোথায় তুমি!

সামান্য দূর থেকে জবাব এল, দেখতে পাচ্ছেন না?

জ্যোৎস্নায় সব স্পষ্ট দেখা যায় না লীনা।

কাছে আসুন না। ভয় নেই, কেউ আপনাকে খেয়ে ফেলবে না।

ওর কাছে যেতেই সে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল। আমার ভেতরে যন্ত্রণা আরও অস্থির হয়ে উঠছে। আমার কাছে সে কি চায় আমি জানি, আমি আরও বেশি পাগল, তবু মানুষের যে কি থাকে, কেমন সেই নিরিবিলি কঠিন মায়া, অথবা কুয়াশার মতো অহংকার কখনও কখনও তাকে খুব সতর্ক করে দেয়। এ-সময় আমি নিজের মধ্যে সমান্য সতর্ক থাকার চেষ্টা করলাম। মানুষের নীতিবোধ বলতে এই সতর্কতা কিনা জানিনা, বার বার এতক্ষণ যা চাইছিলাম, সারাদিন ধরে যা আমাকে পাগলের মতো করে রেখেছিল, খোলা মাঠে এবং হাতের নাগালে যখন সব, তখন নীল ভূখণ্ড আবিষ্কারে অবিচল থাকতে পারছিনা আর।

তখনই লীনা বলল, কি দাঁড়িয়ে থাকলেন কেন ?

এত সাহস মেয়ের। বললাম, তোমার মানুষটি আসবে—কাল, আজ যে কোন দিন—তার কাছে তুমি···

লীনা বলল, জানতাম না। সে হাঁটতে থাকল।

কি জানতে না।

আপনি এত কাপুরুষ।

মাথা হেঁট করে বললাম, লীনা তুমি বিশ্বাস কর—

বিশ্বাস করা না করার কি আছে।

এবং উভয়ে আমরা বুঝতে পারছি সেই উগ্র ইচ্ছে আমাদের মধ্যে মরে আসছে। আমরা ব্যবহারে কেউ কারো প্রতি ঠিক ছিলাম না। লীনা একজন পুরুষের কাছে এর চেয়ে নিষ্ঠুর আচরণ আর কি আশা করতে পারে।

বললাম, লীনা শোন।

লীনা বলল, চলুন। ওরা আমাদের খুঁজতে বের হতে পারে।

তবু আবার বললাম, লীনা শোন।

লীনা বলল, শুনছি। আপনি বলে যান।

আমার দিকে তাকাও।

না তাকাব না।

কি হবে তাকালে ?

আপনাকে স্পষ্ট দেখতে পাব না।

যতটুকু দেখতে পাও

ওতে আমার পেট ভরবে না।

লীনা!

আমরা এসে গেছি।

লীনা!

বলুন।

তোমার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে ?

সব বলে দেবেন।

কি বলে দেব ?

এই যে, যেমন…

আমাকে এত ছোট ভাবলে কি করে !

আপনি সব করতে পারেন।

হত্যা।

তাও।

লীনা।

হ্যাঁ পারেন আপনি। আপনার মতো মানুষেরাই পৃথিবীর সব রকমের সমস্যার মূলে।

লীনা !

বলুন।

সমস্যাটা কিসের।

এই যেমন আপনার নীতিবোধ, আপনার স্ত্রী এবং আমি—সব মিলেই একটা সমস্যা। আমার প্রতি আপনি এইটুকু বলেই লীনা চুপ করে গেল।

চুপ করলে কেন ?

আপনি বলুন এটা একটা হত্যার সামিল কিনা ?

আমার আর যেন কোন প্রশ্ন নেই। নিজেকে সত্যি ভারি, নীচ হীন মনে হল। পাশে লীনা। বললাম, হত্যার যে কোন সাজা দিতে পার। কথাবার্তায় কেমন নাটক এসে যাচ্ছিল। লীনা হেসে দিল, বলল, মানুষেরই এগুলো হয়। কি যেন বললেন, শাস্তি পেতে চান। আদালতের রায় চান। বলে আরও চপল হয়ে উঠল। তারপর বলল, আপনি এত ভালমানুষ বুঝতে পারিনি। শাস্তি একটাই প্রাপ্য—সে যখন আসবে, তার সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেব।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

সকাল না হতেই নিয়তি দরজায় কড়ার শব্দ পেল। চোখে ঘুম লেগে আছে। চোখ ঠিক ভাল করে মেলতে পারছে না। ঘুম চোখেই সে সুইচ টিপে আলো জ্বেলে প্রথমে জানলা খুলে দেখল কে কড়া নাড়ছে। পাশে কিছু পাতাবাহারের গাছ। রাতের অন্ধকার গা মাখামাখি করে এখনও পাতাবাহারের গাছগুলোর সঙ্গে মিশে আছে। মানুষটা তার রাতে ফিরছে না এমনই সে খবর পেয়েছিল। তবু মনে একটা আশা ছিল, ফিরতেও পারে। এবং সেই যে ফিরে এসেছে এটাও তার মনে হয়েছে। তবু এই সব শহরের ঘর বাড়িতে বড়ই সতর্ক থাকতে হয়। খবরের কাগজগুলিতে রোজ যা সব বীভৎস খবর বের হয় তাতে করে কড়া নাড়লেই হুট করে দরজা খুলে দিতে নেই। সে সবসময় যেমন জানালা খুলে পাতাবাহারের গাছগুলির ফাঁক দিয়ে দেখে আজও তেমনি দেখতে গিয়ে বুঝল, তারই মানুষ।

সে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বলল, এত সকালে!

সরল কিছু বলল না। বারোন্দার আলো কম পাওয়ারের। সেই আলোতে দেখল নিয়তি রাতে বেশ নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছে। মুখ ভরাট। চোখে ঘুমটা লেগে আছে। এবং এখন গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেই নিয়তি আবার গাঢ় ঘুমে ঢলে পড়বে। সে এই রাতটা কি করেছে, কিভাবে কোথায় কেটেছে এবং সঙ্গে যখন দু তিনজন যুবতী ছিল, তখন যে অনেক কিছু হয়েও যেতে পারে— চোখে মুখে তার বিন্দুমাত্র সংশয়ের চিহ্ন নেই। সরল এ জন্যই বুঝতে পারে সে খুব একটা বেশি দূর এগোতে পারে না। এমন নিশ্চিন্ত

বিশ্বাস নিয়ে যার বৌ স্বামীকে ছেড়ে রাতে এত ভাল ঘুমোতে পারে কথাটা মনে হতেই সহসা সে একটু চমকে গেল। নিয়তির দিকে ফের তাকাল। কোথায় যেন এই কথাটার মধ্যে কুট রহস্যের গন্ধ পায় সে বলল, তোমার ভয় করেনিত।

কিসের ভয়।

আমি ছিলাম না।

তাতে কি হল।

না, এই আর কি। বলে সে দরজা দিয়ে ঘরে ঢোকার সময় দেখল নিয়তি তার আগে আগে যাচ্ছে। খাটে শুয়ে পড়ে বলছে তোমার হলে আলোটা নিভিয়ে দিও।

সরলের কেন জানি একটা বড় দীর্ঘনিশ্বাস বুক বেয়ে উঠে এল। সে সোফায় হাত পা এলিয়ে বসে পড়ল। নিয়তির উচিত ছিল আরও অনেক প্রশ্ন করা। উচিত ছিল, একটু মান অভিমান করা। নিয়তি এত স্বাভাবিক যে মনে হল আসলে নিয়তি রক্তমাংসের মানুষ নয়। নিয়তির ওপর তার কেমন একটা রাগ অথবা বলা যেতে পারে নিয়তির ওপর এক ধরণের দুঃখবোধে সে পীড়িত হতে থাকল। নিয়তির কোথাও একটা তার জন্য ভারি অবহেলার জায়গা রয়েছে। অথবা নিয়তি কি ভাবে, তুমি কতদূর যেতে পার আমি জানি বাছা। তোমাকে নিয়ে আমার খুব একটা ভয় নেই। আসলে নিয়তির এই সংশয়হীনতা তাকে কিছুটা বিমূঢ় করে রাখল। সে ভেবেছিল, নিয়তি আর কিছু না হোক, দু চারটে ঠাণ্ডা কথাবার্তা বলবে। যাতে বুকে বেঁধে। অবশ্য সে জানে, এই পাঁচ সাত বছরে নিয়তি কেমন খুব বেশি একটা ঘরমুখো, এবং ভেতরে এক ধরণের উত্তেজনা বিহীন জীবন। এতটা কি খুব ভাল! না কি খুব একটা জটিল দ্বন্দ্ব থেকে নিয়তি এত বেশি ঠাণ্ডা মেরে গেছে!

সে এবার উঠে বিছানার পাশে আসতেই দেখল, নিয়তির বুকে

হাত, হাঁটুর ওপর সামান্য শাড়ি ওঠানো, ওর বুক এবং জংঘাতে এখনও যে কোন সুন্দরী যুবতীর মতো পবিত্রতা। নিয়তি ঘুমে আচ্ছন্ন। সে পাশে দাঁড়িয়ে নিয়তিকে দেখছে, এবং দেখতে দেখতে অন্য কোন মেয়ে তার জংঘা, বুক, মুখ গোটা শরীর দিয়ে বরফের মতো সূচ ফোটাচ্ছে শরীরে অর্থাৎ লীনা নামক একটা মেয়ে সারাদিন সারারাত তাকে পাগলা করে রেখেছিল—শুধু নিয়তির আত্মবিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে সে কিছু করতে পারেনি। তারপর এই সকালে ফিরে এলে নিয়তির এত বেশি আত্মবিশ্বাসে সে কেমন একটা গভীর খাদে পড়ে গিয়েছে। খাদটা এত উঁচু যে ওপরের কিছুই দেখা যায় না। নিচে শুধু পাথর এবং কিছু ছোট ছোট ঝোপজঙ্গল। এই খাদ থেকে সে নিজেকে উদ্ধার করতে গিয়ে দেখেছে, পাথরে অথবা ঝোপজঙ্গলের লতাপাতায় তার পা হড়কে যাচ্ছে, অথবা আটকে যাচ্ছে। সে কিছুতেই খাদ বেয়ে ওপরে ওঠতে পারছে না। ওপরের আলো বাতাস না পেলে তার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব না। আসলে এটা আত্মবিশ্বাস না আকর্ষণের অভাব। আসলে নিয়তির ভালবাসায় কোন খাদ আছে না অন্য গভীর কিছু এ-ধরণের কূট প্রশ্ন মনের মধ্যে উঁকি দিলে, সে ডাকল, নিয়তি ঘুমোলে।

নিয়তি জড়ানো গলায় বলল, হুঁ।

পাশে একটু শোব।

নিয়তি সেই জড়ানো গলায় আবার বলল, হুঁ।

একটু সরে শোওনা।

নিয়তি পাশ ফিরে শোল।

সামান্য জায়গা পাওয়া গেছে এবং এরই মধ্যে শোওয়া যায়—কিন্তু তখনই মনে হল, সে হাত মুখ ধোয়নি, জামা কাপড় ছাড়েনি, অথচ ভেতরে সে সেই দুপুর থেকে রক্ত মাংসে হাড়ে মজ্জায় এক কঠিন অসুখে পড়ে গেছে। যেটা তার বার বার কতবার, দিন নেই দুপুর

নেই একসময় উঠে পড়লেই সে স্থির থাকতে পারত না। সে তখন নিয়তিকে লণ্ড ভণ্ড করে ছাড়ে। সারাদিন সারারাত রক্তের সেই অসুখটা জ্বালিয়েছে—এখন হাতের কাছে নিয়তিই একমাত্র সম্বল, যে তাকে নিরাময় করে তুলতে পারে। সে তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে গেল হাত মুখ ধুল। চোখ জ্বালা করছে। এবং জামা কাপড় ছেড়ে সে যখন নিয়তির খাটে শুতে এল, আশ্চর্য নিয়তি ঘুমে যথার্থই এলে পড়েছে। সে ডাকল, নিয়তি। নিয়তির সাড়া নেই। এবং তখনই একটা দৈত্য সহসা তার মধ্যে জেগে উঠল। সে রাগে দুঃখে নিয়তিকে উলঙ্গ করে দিতেই ঘুম ভেঙ্গে গেল নিয়তির। সে উঠে বসল। বলল, কি হচ্ছে! বুনো জেগে যাবে।

আমার খাটে এস নিয়তি।

ভাল লাগছে না।

না এলে মরে যাব।

কি হয়েছে তোমার?

তুমি বুঝবে না। এস।

নিয়তি বলল, সময় অসময় নেই!

না নেই।

তুমি শুয়ে পড়গে। আমার শরীরটা ভাল নেই।

নিয়তি নিয়তি, বলে সরলের চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হল। নিয়তি, তুমি কি করছ, কেউ দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে তুমি কেন বুঝতে পারছ না। সে আমার রক্ত মাংসে সেই দুপুর থেকে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমি পুড়ে মরি তুমি চাও। অথচ সে একটা কথা বলতে পারল না। নিয়তির যেন কোন দুঃখ নেই, তাপ উত্তাপ নেই। সে মনে মনে আবার বলল, নিয়তি এতটা নিশ্চিন্ত থাকা তোমার ভাল নয়, তোমার সব পবিত্রতা আমাকে রক্ষা করে থাকে। আসলে এখন বুঝতে পারছি না, এটা তোমার পবিত্রতা না অবহেলা।

অথবা তোমার কি এমন কোন বড় মাঠ আছে সামনে, যেখানে এই সরল দাঁড়ালে তাকে স্পষ্ট দেখা যায় না।

সরল এবার আরও বড় রকমের দৈত্য হয়ে গেল। দু হাতে পাঁজাকোলে করে তুলে ফেলল নিয়তিকে। নিয়তি বলল, এই কি হচ্ছে। আমি চিৎকার করব। বুনো বুনো।

সরল বলল, নিয়তি লক্ষ্মি।

না আমি পারব না।

সরল বলল, বেশিক্ষণ লাগবে না।

না আমি পারব না।

একটু দেখলেই হয়ে যাবে।

এবং নিয়তি এবার চোখ খুলে তাকাল। দেখল সরল কেমন অসহায়। চোখ দুটো ভীষণ অস্থির। নিয়তি বুঝল, সারাদিন সেই যুবতীরা তাকে মাঠে ছুটিয়েছে। ছুঁতে দেয়নি। এবং ভেতরে কেমন একটা অহংকারে পেয়ে বসল নিয়তিকে। সে বলল, এই সকালে বুনো জেগে গেলে কি হবে বলত?

দরজা বন্ধ করে দিচ্ছি।

নিয়তি অগত্যা পা ছড়িয়ে সরলের খাটে শুয়ে পড়ল। আর সরল পাশে শুয়ে জড়িয়ে বলল, নিয়তি তুমি কি ভাল, তুমি কি সুন্দর এবং নিয়তির গভীরে প্রবেশ করার মুখে দেখা গেল সরল আশ্চর্য রকমের শীথিল হয়ে গেছে। নিয়তি হেসে উঠল। যা এই তোমার ঘোড় দৌড়।

সরল কেমন বোকার মত বলল, কি করব হয়ে গেলে। সেই সেই কখন থেকে বলছি।

নিয়তি উঠে পড়ল। বাথরুমে ঢুকে শাড়ি পাল্টাল। চোখে মুখে জল দিল। তারপর ঘরে এসে বলল, চা করব?

সরল এখন কেন জানি আর কোন যুবতীর প্রতিই টান অনুভব করছে না। এমন কি নিয়তির চলা ফেরায় যে একটা আশ্চর্য সৌন্দর্য

থাকে এখন এই মুহূর্তে তাও সে অনুভব করতে পারল না। অথচ এক দণ্ড আগে এই নিয়তির স্তন জংঘা এবং শরীর পৃথিবীর সব চেয়ে মূল্যবান সামগ্রী আর এক দণ্ড পরে শরীরের সেই কীট নির্গত হলে এই শরীর এত মূল্যহীন হয়ে যায় কি করে। এবং লীনা, লীনার স্তন জংঘা ওর সুন্দর লম্বা হাতও এ সময় মনের মধ্যে কোন ঝড় তুলতে পারল না। আসলে নিয়তি ছিল লীনার ডামি। সে নিয়তির এক ঘেয়ে ব্যবহারের জায়গাগুলিতে লীনার সব কিছুকে গ্রাস করতে চেয়েছিল, ফলে ছুঁতে না ছুঁতেই তার হয়ে গেছে। যেন এমন অপদস্থ সে জীবনেও কোথাও কারো কাছে হয় নি। নিজেকে কাপুরুষ মনে হল। নিয়তি তাকে কাপুরুষ না ভাবুক, অন্তত পরাজিত যুবক ভেবেছে, ভাবতে পারে, ওর সবটুকু সবই বাদ গেল এবং কেমন একটা অপরাধবোধ জেগে ওঠলে, সে পাশ ফিরে শুলো। নিয়তি চা নিয়ে এসে দেখল, সরল পাশ ফিরে শুয়ে আছে। সে ডাকল, এই ঘুমোলে!

না।

চা নাও।

রাখ।

নিয়তি সেণ্টার টেবিল টেনে এনে বলল, চা খাও। এবং তার-পর নিয়তি জানালা দরজা খুলে দিল। বাইরে সকাল হয়ে গেছে। গোয়ালা দুধ দিয়ে গেছে। বুনো স্কুলে যাবে, ওর খাবার টিফিন, মানুষটা অফিস যাবে, তার খাবার টিফিন এবং সংসারে এক গাদা কাজ, ঝি অন্নদা মাঝে মাঝেই কামাই দেয়। ও না আসা পর্যন্ত একটা অস্বস্তি থাকে নিয়তির। এবং হাতের কাজ কিছু কিছু আগেই এগিয়ে রাখে, যেন অন্নদা না এলেও খুব একটা অসুবিধে না হয়। ফ্রিজ খুলে প্রথমেই ঠাণ্ডা খাবার গুলো মিডসেফে তুলে রাখে—এবং সরল বাজার করে ফিরতে না ফিরতে বুনোকে খাইয়ে দাইয়ে পোষাক পরিয়ে সাজিয়ে রাখতে হয়। সরল বুনোকে নিয়ে রাস্তার মোড়ে

চলে যায়; গাড়ি এলে তাকে তুলে দিয়ে ফিরতে ফিরতে নিয়তিকে সরলের চানের জল গরম করা থেকে টুথব্রাস, প্যাণ্ট শার্ট, অর্থাৎ সরল কি পরে অফিস যাবে—কি খাবে সবই তাকে অতি দ্রুত হাত চালিয়ে করতে হয়। সুতরাং নিয়তি দেখল না, সরল পাশ ফিরে চা খাচ্ছে কি না। সে বুনোকে তুলেই হাত মুখ ধুইয়ে টাসকের খাতা-গুলি সামনে রেখে বলল, দেখে নাও। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলির অনেক রকমের বায়নাক্কা। সব ঠিক ঠাক করে শুতে এমনিতেই নিয়তির দেরি হয়ে যায়। বুনোকে সব তোতাপাখির মতো মুখস্ত করাতে হয়। বি প্লাস পেলে নিয়তির খুব খারাপ লাগে। বুনো, সরলকে নিয়ে এই পৃথিবীতে নিয়তি ভীষণ এক প্রতিযোগিতায় পড়ে গেছে। তার সময় কোথায় এখন সরল পাশ ফিরে চায়ের কাপ তুলে খাচ্ছে কি খাচ্ছে না দেখার।

এই বুনো ওঠ। আর দেরি করিস না মা। নিয়তি বুনোকে ঠেলে তুলে দিল। এবং প্রায় কোলে করে নিয়ে গেল বুনোকে। যেমন সরল কিছুক্ষণ আগে পাঁজকোলে নিয়ে গিয়েছিল তাকে সে তেমনি বুনোকে বাথরুমে এনে হাত মুখ ধুইয়ে দিল। বড় আহুরে—কর হা কর বলছি। তিনবার বললে, একবার হা করে বুনো, সেই ফাকে মুখে জল দিতে হয়, কুলকুচা করে জল ফেলতে চায় না। জল মুখে রেখে দেয়। ফেল, ফেলে দে। কত আর দেরি করবি। ব্রাস ঘসেতো ঘসেই। হয়েছে বুনো। এবার মুখ ধোও। চোখ মুখ পরিষ্কার করে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছিয়ে দেবার সময় সহসা মনে হয়, এভাবে তার মাও তাকে ডাকত, নিয়তি উঠে পড়তে বোস। তোর মাস্টার-মশাই এসে যাবেন। আসলে সবাই এ ভাবে মেয়েদের ছেলেদের বড় করে দেয়। এবং বড় করে দেবার পর তারা আবার ছেলেদের মেয়েদের বড় করতে থাকে। সেই কবে থেকে এ ব্যাপার চলে আসছে—নিয়তির মনে এমন সব চিন্তার জট পাক খায় এবং একসময় দেখতে পায় ঘরে ঢুকে, সরল নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। চা ঠাণ্ডা

মানুষটাতো ভীষণ বোকা। বোকা না পাজি, না বদমাস না কি গুণ্ডা। সে ভাবল ডাকে, অফিসে যাবে কিনা, অফিসে না যাক বুনোকে গাড়িতে তো তুলে দিতেই হবে। বাজার দু একদিন না হলেও ক্ষতির কিছু নেই। এবং রোজই বাজারে যাওয়ার দরকারও হয় না। তবু সরল রোজ বাজার থেকে তাজা শাকসব্জি আনতে ভালবাসে। আসলে ওর এটা একটা হবি। এবং সে জন্য নিয়তি ভাবল, যখন ঘুমোচ্ছে, ঘুমাক। সারাদিন সারারাত কাল কি করেছে কে জানে।

বুনোর স্কুলে যাবার সময় হয়ে গেলে ডাকল, এই ওঠো। ওকে তুলে দিয়ে এস।

সরল এতক্ষণ একটা স্বপ্ন দেখছিল—স্বপ্নটা একটা হিজলগাছের। হিজল গাছ আর হিজল গাছ। এবং হিজলের ফুল পড়ে গোটা মাঠ সতরঞ্চের মতো দেখতে হয়ে গেছে। আর পুরু হিজল ফুলের কার্পেট মাড়িয়ে সে আর কেউ, কে সেটা, লীনা, না মুখটা ঠিক লীনার মতো নয়, কেতকীর মতো কি, না তাও নয়, কার মুখ তবে, শুভেন্দুর বৌ, শুভেন্দুর বৌ শীলাতো এত লম্বা নয়—আসলে স্বপ্নে সে মুখটা বোধ হয় দেখতেই পায়নি—কেবল পেছনটা দেখেছে। সেই পেছন দেখার লোভে সে এতটা রাস্তা, এবং হিজলের জঙ্গল পার হয়ে কোন নদীর স্রোতে ভেসে যেতে পারে ভাবতেই মনে হল সামনেটা দেখলে না জানি তার কি হত! সে হাই তুলে বলল, বুনো মা আমার কোথায়?

বুনো লাফাতে লাফাতে কোথা থেকে এসে হাজির। এই যে বাবা।

স্কুলের ইউনিফরম পরা বুনোকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। তাজা ফুলের মতো ফুটে আছে। বুনোর চুল ঘাড় পর্যন্ত, বড় সুন্দর করে ছেটে আনে নিয়তি। চুল ছড়ানো। গাল ফুলো ফুলো। দু গালে হাসলে টোল পড়ে বুনোর। সরল কিছুক্ষণ আপলক তাকিয়ে থাকল

মেয়ের দিকে। মেয়েটা একটা তাজা পুষ্ট মুরগি হয়ে যাচ্ছে। কেউ ঠিক ছিড়ে ছিড়ে খাবে। সে যেমন নিয়তিকে খাচ্ছে, শুভেন্দু যেমন লীনাকে অর্থাৎ পৃথিবীর যাবৎ রমনীকুলের একই দশা। এর জন্য এত !

বুনো বলল, ও মা বাবা দেখ কেমন তাকিয়ে আছে !

সরলের হুঁস ফিরলে বলেল, তোমার হয়েছে ?

নিয়তি রান্নাঘর থেকে বলল, মেয়ে তোমার কিন্তু কিছু খেল না।

কি খেলে না কেন বুনো ?

আমার খেতে ইচ্ছে করছে না বাবা।

এত সকালে খায়ই বা কি করে। তবু সরল বাবা বলে বলল, খেতে হয় বুনো। সারাটা দিন স্কুলে থাকবে খিদে পাবে।

এই সব কথা রোজই সরলকে বলতে হয়। একঘেয়ে তবু বলতে হয়। বাবা বলেই বলতে হয়। বাবা বলেই মেয়েকে বড় করে তুলছে। কেউ খাবে, খাওয়াটা যত সুস্বাদ হয় তার জন্য সরলের সতর্কতার অভাব নেই। সরল বলল, কি টিফিন দিল তোমার মা ?

বুনো লাফাতে লাফাতে আবার চলে গেল। টিফিনের বাকসটা নিয়ে এল। খুলে দেখাল সরলকে—একটা হাফ বয়েল ডিম চার পিস টোস্ট, একটা সন্দেশ এবং পাঁচ সাত কোয়া কমলা। বেশ টিফিন। রক্তে যাতে সব রকমের প্রোটিন এবং ভিটামিন সরবরাহ হয় নিয়তি খুব সুক্ষ্ম ভাবে তার ব্যবস্থা করেছে। অঙ্গ সজ্জা ঠিকঠাক রাখছে মেয়ের। দুর্বল হয়ে গেলে বিপদ। ঠিকমতো ঘোড় দৌড়ের মাঠে বাজি খেলতে পারবে না।

তারপরই সরল গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। সে তো বাপ, ছাইপাশ কি সব ভাবছে বুনো সম্পর্কে। লীনাকে দেখার পর এবং খুবই নীতিবাগিশ হয়ে পড়ায় মনে মনে সে নিজের ওপর খুবই ক্রুদ্ধ। অথবা বলা যেতে পারে ক্ষোভে জ্বলছে এবং নিয়তির গভীরে ঢুকে যাবার মুখেই সব হয়ে যাওয়ায় প্রানীজগতের মত নারীজগতেও একটা

ঘুনসি পাক খেয়ে আছে পুরুষের শরীরে এমন মনে হল তার। সে নিয়তিকে বলল, আমি বের হচ্ছি। দরজাটা বন্ধ করে দাও।

তারপর মেয়েকে গাড়িতে তুলে দিয়ে টাটা করতে করতে যখন ফিরে এল, তখন বাজে নটা। এবং এসেই স্নান। নিয়তি বলল, আজ ছুটি নিলে হত না। বলে ট্যারচা চোখে তাকাল সরলের দিকে। সকালে এমন জব্দ হওয়ার পর নিয়তিকে নিয়ে একা একটা ফ্ল্যাটে সরলের থাকতে আর সাহস হল না। সে বলল, না যাই। মেলা কাজ। মাস্তুদির আজ আবার আসার কথা।

নিয়তি মুচকি হাসল। সরল খুব লাজুক বালকের মতো এবারে স্নান করতে ঢুকে গেল বাথরুমে। যেন গা ঢাকা দিল কতকটা, তারপর টেবিলে খেতে বসে দেখল, সব খাবারই পারিপাটি করে সাজানো। কাল নানা কারনে শরীরে অনিয়ম গেছে পেটে তেমন খিদে নেই তবু এত পরিপাটি করে সব কিছু সাজিয়ে দেওয়ায় সরল সামান্য বিরক্ত মুখে বলল, এত খাওয়া যায়!

অন্যদিন তো খাও।

রোজই একবকম খেতে হবে বলে কোন কথা আছে?

তাতো নেই। কেউ একরকম খায়ও না। নিয়তি এই বলে পাশে মোড়া নিয়ে বসল। বলল, যা পার খাও। বাকিটা আমি খাব।

সরল ভাত ডাল আর মাছ ভাজা দিয়ে কিছুটা খেল। কিছুটা ঝোল দিয়ে খেল। সামান্য দই আছে—ফ্রিজ থেকে আগে নামাতে বোধ হয় ভুলে গেছে, খুবই ঠাণ্ডা, সে মুখে দিয়ে জিভ আলগা করে ফেলল। কি যে কর না!

নিয়তি এবারেও হাসল। তারপর বলল, তোমায় মন ভাল নেই। সব কিছুতে খুত ধরছ।

সরল তাকাল না। নিয়তি অন্যদিন হলে ঝগড়া করত। সে বুঝেছে আজ যতই সে খুত ধরুক নিয়তি ঝগড়া করবে না। কারণ

সকালে নিয়তির শরীর সামান্য উষ্ণ না হতেই সে যা করে ফেলেছে তারপর নিয়তির পক্ষে আর ঝগড়া করা সম্ভব না। এখন নিয়তিকে খুব সুবোধ বালিকা হয়ে থাকতে হবে, এবং সে ঠিক যখন অফিস থেকে ফিরে আসবে, নিয়তি চুল পরিপাটি করে বেধে রাখবে। মুখে পাউডার এবং এমন পোষাক পরে থাকবে যাতে করে সে লাফিয়ে পড়তে পারে নিয়তির ঘাড়ে। এ-সুখটা বড় সুখ। এটার জন্যই সে বুঝতে পারছে নিয়তির এত তোয়াজ।

অফিসে বের হবার মুখে নিয়তি বলল, কোথাও যেওনা আবার। সকাল সকাল চলে এস। খুব ভয় লাগে।

সরল মনে মনে বলল, কচি খুকি! ভয়। তারপর সিঁড়ি ধরে নেমে যাবার সময় বলল, দরজা বন্ধ করে দাও। সকালেই ফিরছি। অসুবিধা হলে ফোন কর।

নিয়তি দরজা ফাঁক করে খোলাই রাখল। অসুবিধা হলে ফোন করতে বলেছে। এতটা ভাবে কি করে সে! সেতো এত বেহায়া নয়। মনের মধ্যে কেমন একটা সূক্ষ্ম কীট দংশন করল তাকে। বলল, নিজে পারনি, যত দোষ আমার। অসুবিধা হতে যাবে কেন। তুমি কি আমাকে বাজারে মেয়ে ভাব! আশ্চর্যরকমের একটা গ্লানিবোধে নিয়তি পীড়িত হতে থাকল।

তখন লীনা বলে মেয়েটি ঘুমে বিভোর। সারারাত জেগে শরীর ক্লান্ত ছিল। ফিরে এসে দরজায় কড়া নাড়তেই বাবা উঠে এসেছিলেন, দরজা খুলে দিয়েছিলেন, শীলা কেতকীরা দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল, বাবা ওদের বসতে বলেছিল ওরা বলেছিল না মেশোমশাই, এখন না। লীনা জানে বাবা খুবই সৌজন্যপরায়ন মানুষ, বাবার পক্ষেই মানায় এ-সব কথা। তার তখন দাঁড়াবার মতোও অবস্থা ছিল না। বাথরুমে ঢুকে কোনরকমে জামা কাপড় পাল্টে খাটে সেই যে শুয়ে পড়েছিল এবং গভীর ঘুমে ডুবে গিয়েছিল তারপর কখন তার সায়া শাড়ি হাঁটুর উপরে উঠে এসেছে এবং

লেপের নিচে তার শরীর এক আশ্চর্য উষ্ণতায় ভরে গেছে জানে না।

সেও একটা স্বপ্ন দেখছিল। সেই স্বপ্নটা একটা পাইন গাছে বড় একটা তিমি মাছের কংকাল। মৈত্র বলে লোকটা মাউথ—অরগান বাজিয়ে একটা অচেনা বন্দরে হুঁই হুঁই করে ছুটে বেড়াচ্ছে, আর যুবতির দল ওর পেছনে নেচে নেচে যাচ্ছে। তারপরেই সে দেখল একটা বড় পাহাড়, মাথায় সেই ভালোমানুষটি তাকে হাত ইশারা করে ডাকছে। তারপর এক ঝাক পায়রা উড়ে গেল মানুষটার মাথার ওপর দিয়ে এবং একটা বড় হলুদ রঙের পতাকায় ঢেকে গেল মানুষটা। লীনা পাগলের মতো সেই ভালমানুষের কাছে যাবার জন্য হাঁটুর ওপর শাড়ি তুলে পাথর ভেঙ্গে ওপরে ওঠে যেতে যেতে দেখল সবটাই সে তুলে ফেলেছে—আর লীনার এমন একটা কিম্ভুত কিমাকার নগ্ন ছবিতে ভালোমানুষটা ভারি লজ্জা পেয়ে হলুদ পতাকাটা তার দিকে ছুড়ে দিল। পতাকাটা ক্রমে পালতোলা নৌকা হয়ে গেল। নৌকায় দুজন আরোহী। একজন তার স্বামী, অন্যজন সেই ভালোমানুষটি। তারপর নৌকাটা পালে বাতাস পেয়ে বেগে ছুটছে। লীনা নদীর পাড়ে পাড়ে ছুটছে। নৌকাটা একটা ঘাটে থেমে গেল। লীনা নিজেই নৌকা থেকে লাফিয়ে পড়ল। কেউ নেই। দুজন আরোহী ছিল নৌকায় তারা কখন অদৃশ্য হয়ে গেছে। এবং ঘাটে ভিড়তেই মনে হল নৌকা একটা না, অনেক। অনেক লোকজন, মাঝি মাল্লা, তাল আনারস কাঁঠাল এবং তরমুজের নৌকা। সে লাফিয়ে লাফিয়ে নৌকাগুলি পার হয়ে যাচ্ছে। ওরা যে কোথায় গেল! সে খুঁজছে এবং খুঁজতে খুঁজতে একটা মেলায় সে এসে গেল কি করে! আর আশ্চর্য লীনা দেখছে সারকাসের তাঁবুতে সেই আরোহী দুজন নেচে নেচে ব্যাগপাইপ বাজাচ্ছে। লীনাকে দেখতে পেয়েই জিভ কেটে ফেলল। এবং লাফিয়ে দৌড়াল। লীনা খুব ক্লান্ত আর পারছে না, সে উঠে যাবে—মেলাটা ঘুরে ফিরে

দেখবে ভাবছে, কাচের চুরি কতদিন পরে না, সে কাচের চুরি কেনার জন্য হেঁটে যাচ্ছিল, আবার তখনই দেখল মেলার অন্য কিছু সুন্দর পুরুষ তাকে দেখে ইশারা করছে। সে বলল, শরীরটা ভাল নেই— ওরা যে কোথায় গেল! ওরা বলল, ওরা কে? লীনা বলল আমার স্বামী, আমার ভালোমানুষ।

তোমার ভালোমানুষ আছে?

খুব ভালোমানুষ। এত করে বললাম তবু…

তবু কি?

করল না।

ছি অমন লোক আবার কখনও ভালোমানুষ হয়।

কেন হয় না?

চাইলে যে দেয় না সে ভালোমানুষ কি করে?

লীনা বলল, তার বৌ আছে।

বৌ চাইলে সে না দিয়ে থাকে?

সব সময় দিতে ইচ্ছে হয়?

কিন্তু তোমার বেলাতে?

ইচ্ছে ওর ষোল আনা ছিল। কিন্তু ওর মনটা ভারি নরম।

তোমার দুঃখটা বুঝি দুঃখ নয়!

লীনার মনে হল সত্যি তো। ভালোমানুষ তার দুঃখ বোঝেনি। সে বলল, তোমরা ঠিকই বলেছ। লোকটা আসলে পাজি নচ্ছার।

আমাদের সঙ্গে তবে এস না!

লীনা আশ্চর্য হয়ে দেখল পুরুষরা সবাই ওর কলেজের বন্ধু যাদের সে বিয়ের আগে ভালবেসেছিল, গোপনে শরীর দিয়েছিল, অথবা শরীর দিতে ইচ্ছে হয়েছিল, অথবা পথে ঘাটে এবং কোন ভ্রমণে যে সব পুরুষের শরীর তার রোমকূপে হুল ফুটিয়েছিল একে একে সবাই নেচে নেচে যাচ্ছে। আর কি যে করছে সব। আরে তুমি জয়ন্ত না। ওমা কতদিন পর দেখা। তোমার মা

সহবাসের সুখে মদির ছিল, এখন কে রূপ, কে অমল কে জয়ন্ত কে ভালোমানুষ কিছুই মনে করতে পারছে না। তার চোখ মুখ কেমন ঘোর লাগা যুবতীর মতো।

মা বলল, কিরে দাঁড়িয়ে থাকলি কেন?

লীনা বলল, যাচ্ছি।- সে তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে শরীর পরিষ্কার করে সুন্দর সায়া শাড়ি ব্লাউজ এবং গরম চাদর গায়ে দিয়ে টিপ পরে যখন বের হয়ে এল তখন রূপ তার ঘরে।

রূপ বলল, ভাল আছ?

সেণ্টার টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে রূপ কথাটা বলল।

রূপের গায়ে নেভি ব্লু জাহাজী পোষাক। মাথায় সেই এংকোর আকা নীল জাহাজী টুপি। কালো সু মোজা---একেবারে নেভির পোষাকে সে সোজা লীনার ঘরে ঢুকে গেছে। পাশে নীল সুটকেস। নরেশ সুটকেসটা এ-ঘরে রেখেই হাওয়া। মা বাবা কেউ আর এখন এ ঘরে ঢুকবে না। হলুদ পদার ভিতর লীনা এবং রূপ। দুজনই দুজনকে দেখে ভারি মুগ্ধ। যেন কতদিন পর, যেন কতকাল পর, কত দীর্ঘকাল পর ওরা দুজন আবার নদীর পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

লীনা কাছে গিয়ে বলল, কাল তোমার খোঁজে ডায়মণ্ডহারবার গেছিলাম।

রূপ জানে লীনা এমন করে থাকে। পাগলের মতো সে আসবার খবর থাকলেই ছুটোছুটি লাগিয়ে দেয়। সে সামান্য হেসে বলল, তাই বুঝি।

তুমি ঠিকমতো চিঠি দাওনা কেন। আসলে লীনার এটা প্রতিবারই হয়। রূপ এলে সে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারে না। কি কথা বলবে বুঝতে পারে না। কেমন হতবম্ভ অবস্থা থাকে কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে আসলে একে একে সব খবর নিতে আরম্ভ করে। মান অভিমানে তখন তার চোখ ফেটে জল আসে। রূপ বুঝতে পারে সব। সে পাশে এসে জড়িয়ে ধরে তখন। চুমো

খায়। এবং দুজনই এক অজ্ঞাত রহস্যে ডুবে যাবার আগে প্রবল আকর্ষণে পরস্পর কাছে চলে আসে।

কিন্তু রূপ এবারে দেখল লীনা কিছুটা আত্মস্থ। পাগলের মতো কিছু করে ফেলছে না। স্বাভাবিক না হলেও বিহ্বল ভাবটা একেবারেই নেই। লীনা বলল, বস। পারাদীপে জাহাজ রেখে এলে কেন। কলকাতায় আসার কথা জাহাজ!

কোম্পানীর মর্জি। পরপর সোফায় গা এলিয়ে দিতে দিতে বলল, জাহাজ মেরামতের কথা ছিল সামান্য। নেতাজী সুভাষ ডকে করার কথা কিন্তু পারাদীপে কিছু অর্ডার পেয়ে গেছে। এখন সেই মাল নিয়ে লসএঞ্জেলসে যেতে হবে। সেখানেই জাহাজের কিছু টুকি টাকি মেরামত করে নেবার কথা।

লীনা হাঁটু গেড়ে স্যুটকেসটার পাশে বসল তখন। রূপের কাছ থেকে চাবি চেয়ে নিল। ওর জামা কাপড় বের করতে হবে। অবশ্য আলাদা জামা কাপড় একটা আলমারিতে রূপের তোলা থাকে। সেই আলমারীর চাবিটা ক দিন হল খুঁজে পাচ্ছে না। মানুষটা এতটা ছুটে এসেছে, এখম বিশ্রামের দরকার। কি খাবে, চা না কফি, এবং অন্য সব রকমের চাহিদা লীনাকেই দেখে শুনে মেটাতে হয়। বেলা বেশ হয়েছে। ঘড়িতে দশটা বাজে। অন্য ঘরে মা বাবার গলা পাওয়া যাচ্ছে। জামায়ের খাবারের মেনু নিয়ে ওরা ব্যস্ত! এবং মালি পরেশচন্দ্র পর্যন্ত দৌড় ঝাঁপ শুরু করে দিয়েছে। রাইমণি রান্না ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে একবার মাকে কি যেন বলল। এ-সবই স্যুটকেস খোলার সময় শুনতে পেল লীনা। মাত্র দুটো দিন, এবং এই দুদিন বাড়িটা সহসা এত চঞ্চল হয়ে উঠবে যে মনে হবে বাড়িতে কোন উৎসবের ব্যাপার চলছে।

রূপ লীনার পাশে তখন হাঁটু গেড়ে বসে গেছে। যেন সেও স্যুটকেস থেকে পছন্দ মতো পোষাক বের করতে চায়। অন্যবার লীনা বিহ্বল হয়ে বসে থাকে। কোন কথা বলতে পারে না। এবারে লীনা,

খুবই যেন স্বাভাবিক। এ-সব কাজগুলি করতে হয় লীনার অনেক পরে। রহস্যময়তার গন্ধ শরীরে ভুর ভুর করতে থাকলে ওরা দুজনই একসঙ্গে পালা করে গান গায়। দরজা জানালা সব খুলে দেয় চুল পাট করে ছিমছাম পোযাকে বাইরের ঘরে গিয়ে বসে রূপ। অথচ এবারে সেই আগের মতো লীনা ওকে জড়িয়ে ধরছে না। সে নিজেই পাশে বসে হাত দিল, কিছুটা ছুঁয়ে দেখা, সব ঠিকঠাক আছে কিনা। লীনা বলল, জামা কাপড় ছেড়ে নাও। সব হবে। আমিতো মরে যাচ্ছি না।

রূপের সে-সব শোনবার মতো সময় নেই। সারাটা সফর সে এই এক মেয়ের কথা ভেবে জাহাজে কাটিয়ে দেয়। ঠিক অন্য নাবিকদের মতো বন্দরে নেমে যায় না। তার মধ্যে কি যেন একটা ভয় আছে। সেই ভয়টা তার শৈশব থেকে। কেবল মনে হয় নিজে ঠিকঠাক বেঁচে না থাকলে, লীনাও ঠিকঠাক বেঁচে থাকবে না। ফলে তার সফর খুব দীর্ঘ লাগে। মাঝে মাঝে খুবই কাতর হয়ে পড়ে হোমে ফেরার জন্য। সমুদ্রের নীল জল, নীল আকাশ এবং একঘেয়ে সমুদ্রযাত্রা তাকে মাঝে মাঝে খুবই অস্থির করে তোলে। তখন শুধু চিঠি লেখা। এবং লীনার সঙ্গে তার চিঠিতেও কতবার যে সহবাস হয়েছে—যেমন সে লিখে থাকে, আমরা একটা দ্বীপের পাশ দিয়ে যাচ্ছি লীনা। দ্বীপটার নাম সেণ্ট লরেন্স। দ্বীপে নারকেল গাছ প্রচুর। কিছু পলিনেশীয় যুবতী দূরবীণে ধরা পড়েছে। এমন একটা দ্বীপে তোমাকে নিয়ে একবার চলে আসব। তুমি আমি নিশ্চিন্তে জ্যোৎস্নায় কোন নারকেল কুঞ্জে শুধু খেলা করব। কখনও লেখে ভিক্টেরিয়া পোর্টের লেগুনটা ভারি সুন্দর। দু পাশে পাহাড়। এবং খাদের মত লেগুনটা। আমাদের জাহাজ লেগুনের ভেতর দিয়ে এখন যাচ্ছে। দু পাশের পাহাড়ে, বিচিত্র রঙের সব পাথর। বিচিত্র রঙের সব গাছপালা। ছোট ছোট কুটীর কোথাও, কোথাও। পাহাড় কেটে রাস্তা। আপেল ভর্তি একটা ঘোড়ায় টানা গাড়ি

যাচ্ছে। তুমি এখন কি করছ। দেখতে পাই তুমি একটা পাথরে বসে আছ। চোখ ভারি উদাস। এমন একটা জায়গায় মনে মনে ভাবো না তুমি আর আমি। লেগুনের জলে তুমি আর আমি। তুমি আমি শুধু সাঁতার কাটছি লেগুনের জলে। শরীরে আমাদের কোন পোষাক থাকবে না। লেগুনের জল থেকে ওস্টার তুলে লেবুর রস মেখে খাচ্ছি, কি মজা! তারপর ছোট ঝোপের পাশে তুমি শুয়ে আছ। মাথার ওপরে নীল আকাশ, অজস্র গাছপালা আর পাখি। কীটপতঙ্গের বিচিত্র আওয়াজ। তুমি বলছ, এই। আমি বলছি, এই তোমার হাত আমার হাতে। তুমি আমাকে জড়িয়ে আছ। আমি তোমাকে জড়িয়ে আছি। না লক্ষ্মীটি এত তাড়াতাড়ি কর না। আরও রাখো। তুমি বলছ এমন। আমার যে কি হয়, তোমার সঙ্গে পেরে ওঠি না। তুমি তখন কাতর গলায় বলছ, রূপ তাড়াতাড়ি হলে আমি মরে যাব। আমাকে তুমি আর খুঁজে পাবে না। শরীরকে চাঙ্গা রাখার জন্য উঠে পড়ি, একটু অন্যমনস্ক হই। এবং এতে সাহস এবং শক্তি দুই বাড়ে। ধরে রাখার ক্ষমতা বাড়ে। আবার শুই, এবং অনেকক্ষণ ধরে তোমার গভীরে চুপচাপ আমি এবং আমার অস্তিত্ব নিমজ্জিত থাকতে কি যে ভাল লাগে। তুমি তখন শরীরটাকে সাপের মতো প্যাচিয়ে প্যাচিয়ে একটা মরা সাপ হয়ে যাও। চোখ বুজে আসে তোমার। কেমন পৃথিবী থেকে কোন নির্বাসিতা নারীর মতো লাগে তোমাকে দেখতে। আমি তোমায় পাশে বসে ডাকি, এই। তুমি শুধু বল, ওগো। আবার ডাকি ওঠো। তুমি বল, ওগো। প্রগাঢ় ঘুমের মধ্যে ডুবে যেতে চাও। কোন হুঁস থাকে না। যখন ভাল লাগবে না, এমন একটা দিনের কথা ভাব, সময়ের কথা ভাব। আমি যখন পারিনা, তখন তোমাকে নিয়ে কোন ঝোপজঙ্গলে অথবা সমুদ্রের বেলাভূমিতে শুয়ে থাকি। তখন ভেতরের যন্ত্রনা ধীরে ধীরে কমে আসে। যন্ত্রণার কীটেরা শরীর থেকে বের হয়ে যায়

সরল তখন একটা মিনিবাসে উঠে বসল। বা হাতে পোর্ট-ফলিও ব্যাগ। সে আজ সাদা ট্রাউজার পরেছে। হলুদ রঙের সার্ট এবং নানাবর্ণের কারুকাজ করা সোয়েটার। লাল রঙের টাই। অফিসের গাড়ি সে পায়। হেড অফিস থেকে দু'জন কর্তা ব্যক্তি আসায় তার গাড়িটা দিয়ে দিতে হয়েছে। এরা এখানে একটা বিজিনেস কনফারেনসে এসেছে। পাঁচ সাতদিন থাকবে। সুতরাং অনেকদিন পর আবার একটা মিনিবাসে ওঠা গেল। সাধারণত এখান থেকে মিনিবাসে উঠে বসতে পায় না। ভাগ্য ভাল যে আজ পেয়ে গেছে। এবং তখনই মনে হল, আজ কি কারণে সরকারী অফিস সব বন্ধ। ভাগ্য সুপ্রসন্নের কারণটা ধরতে পেরে আর বেশি উৎসাহ থাকল না।

তার রাস্তাটা কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। প্রথম সে যখন কলকাতায় আসে, এবং এই কারখানায় সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হিসাবে যোগ দেয় তখন, গোটা রাস্তার দু পাশের ঘর দোর, দোকান পাট, পার্ক ময়দান, এবং বস্তি অঞ্চল সবই খুটিয়ে খুটিয়ে দেখত। প্রথম প্রথম সে ট্রাম থেকে সঠিক জায়গায় নামতে পর্যন্ত পারত না। ভুল করে আগে অথবা পরে নামত। তার যাবার রাস্তায় পর পর তিনটে প্যাট্রল পাম্প পড়ে। এবং প্যাট্রল পাম্পের পাশের রাস্তা দিয়ে ওকে ওর কারখানার গলিতে ঢুকে যেতে হয়। সে প্রথম প্রথম, কখও প্রথমটায় কখনও দ্বিতীয়টায় নেমে পড়ত। তারপর কদিন পর সে হিসাব করে বুঝতে পারল পর পর তিনটে পার হলে সে নামবে। সে সব কথা মনে হলে এখন তার ভারি হাসি পায়। এবং এই যে সব পুরোনো হয়ে যাওয়া, তার মতো ব্যর্থতা জীবনে আর কিছু নেই। কারণ আজকাল সে চোখ বুজে থাকলেও ঠিক জায়গায় এলে টের পায়, তার নামার সময় হয়েছে। কোন সতর্কতার দরকার হয় না। তাকে পর পর তিনটে প্যাট্রল প্যাম্পের হিসাব রাখতে হয় না। পথ ঘাট সম্পর্কে বড় নিশ্চিন্ত সে। রাস্তাটা আগে যেমন

লুকোচুরি খেলত এখন আর খেলে না। রাস্তার সব রহস্যই মরে গেছে।

তখনই নিয়তির মুখটা কেন জানি ভেসে উঠল। প্রথম প্রথম সে থাকত বেলেঘাটা অঞ্চলে। নিচের তলার দু ঘরের বাসা নিয়ে সে উঠে এসেছিল এই বড় শহরে। মা তার সঙ্গে এসেছিল। কিন্তু মা আবার বাবাকে ছেড়ে কোথাও বেশিদিন থাকতে পারে না, মাস যেতে না যেতেই মা চলে গেল। নিয়তি একা। তখন বুনো হয়নি। নিয়তির জন্য অফিসে সারাটা সময় সে ভারি উদবিগ্ন থেকেছে। একা নিয়তি —কত কিছু ঘটে যেতে পারে। এবং মাঝে মাঝে অদ্ভুত সব সংশয় তাকে জড়িয়ে ধরত। একবার সে ফিরে দেখেছিল, নিয়তি দরজায় দাঁড়িয়ে পাশের বাসার তার সমবয়সী এক তরুণের সঙ্গে কথা বলছে। ওর ফিরতে একটু দেরি হয়েছিল সেদিন। নিয়তি এবং সেই তরুণ তাকে একটা ভীষণ সংশয়ের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। পাশাপাশি থাকলে যে দুটো একটা কথা হতেই পারে সেটা সে বিশ্বাস করতে পারত না। সংশয় তাকে একসময় পাগল করে দিয়েছিল। এবং সে ভেবেছিল একসময় সংশয়ই নিয়তির প্রতি তার ভালবাসাকে ক্রমে গাঢ় করে তুলেছিল। একদিন সংশয়ের ঘোরে সে গলা টেপার কথা ভেবেছিল, তারপরই চিৎকার করে বলেছিল অত কথা কিসের ছোড়াটার সঙ্গে। নিয়তি বুঝতে পারছিল না, কেন সে ক'দিন থেকে গুম মেরে আছে, পরে বুঝতে পেরে সে কিছুক্ষণ নিজেও গুম হয়ে বসেছিল। এমন সন্দেহ যার তার সঙ্গে কথা বলা অর্থহীন। পরে বোধ হয় নিয়তি বুঝেছিল, আসলে মানুষটা পৃথিবীতে নিয়তি বাদে আর কিছু এখন জানে না। এবং নিয়তি বাদে মানুষটা খুবই নিঃস্ব। এটা বুঝতে পেরেই হয়ত সব খুলে বলেছিল, তুমি আসছ না, কখনও এক মিনিট এদিক ওদিক হয় না ফিরতে। ঘণ্টা পার হয়ে গেল, ঘরে থাকতে পারছি না। জানালায় দাঁড়িয়ে যখন আর পারছিলাম না, তখনই সুজনকে

বললাম, তোমার দাদার অফিসে একটা ফোন করবে! এই ফোন।

আসলে সরল সেই সব দিনের মতো ঘরে ফেরার আকর্ষণ আর তেমন আজকাল বোধ করে না। একটা অত্যন্ত সাদাসিধে বোঝাবুঝি হয়ে যাওয়ায় যে অসারতা ক্রমে দানা বাধতে থাকে সেটা সে আজ সকালে ফিরে এসে টের পেয়েছে। এত বিশ্বাস থাকা খুব ভাল কিনা—এই ব্যাপারটাই তাকে সকাল থেকে খুব কাবু করে রেখেছে। তারপর নিয়তির হেসে ওঠা থেকে আরম্ভ করে গত রাতের ঘটনায় সে প্রায় কেমন একটা নিঃস্ব মানুষ হয়ে যাচ্ছিল। একটা পুরানো রাস্তা দিয়ে সে এখন হেঁটে যাচ্ছে বুঝতে পারল। কোন কিছুই আর নতুন করে দেখার নেই।

টেবিলে বসতেই মনোরঞ্জন বাবু বললেন, স্যার আপনার একটা ফোন এসেছিল।

ফোনতো কতই আসে। এটা নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত ফোন।

সে বলল, কে করেছে?

নাম বলল না। মনে হল কোন ভদ্রমহিলা। বলল, সরল আছে।

সরল আছে বলে একমাত্র তার পুরুষ বন্ধুরাই ফোন করতে পারে। কোন মেয়ে অথবা ভদ্রমহিলা—আত্মীয় কেউ হবে হয়ত।

আত্মীয়দের মধ্যে কে সরল বলে ফোন করতে পারে ভাবতে গিয়ে দেখল, প্রায় কেউ নেই। সরলের আত্মীয়দের মধ্যে পিসিমা থাকেন গোপালগঞ্জে, বড় মাসি তো অথর্ব—ছোট মাসি জোরহাটে এবং সরলের ছোট শ্যালিকা আছে একটি। ওদের বাড়ি থেকে যদি নিলীমার শাশুড়ী ফোন করে থাকে। নিজের শাশুড়ী বড় শ্যালকের কাছে হাজারিবাগে। এবং তখনই আবার ফোন এল। ফোন মনোরঞ্জনবাবুই ধরলেন। রিসিভারে মুখ চেপে বললেন, সেই

ভদ্রমহিলা। সরল হাত বাড়ালে মনোরঞ্জনবাবু বললেন, ধরুন দিচ্ছি। বলেই সরল ফোন ধরতেই বলল, এই যে ভালোমানুষ।

সরল কেমন বোকার মতো শুনল। লীনার ফোন। সে কি বলবে বুঝতে পারছে না। একটি মাত্র কথায় তার সমস্ত সত্তা কেঁপে উঠেছে। তখনই আবার লীনা বলল, ভালোমানুষ, হেল্যো বলে চুপ মেরে গেলেন কেন?

এত সব মুখস্থ লীনার। সামান্য হ্যালো শব্দেই লীনা বুঝে নিয়েছে সেই যুবক, যার নাম সরল, যার হাঁটুর কাছে পা মুড়ে বসে থাকতে চেয়েছিল, যার কাছে নিবেদিত প্রাণ ছিল, সেই সরল যে অকপটে তার শরীরের রক্তে সুমধুর ঘ্রান পেয়েও সরে গেছে···সে বলল, লীনা!

হ্যাঁ। বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল!

কিছুটা হচ্ছিল।

কেন বলুন তো।

ফোন নম্বর পেলে কি করে!

অসুবিধা খুব নম্বর পাওয়া?

না তা অবশ্য বলছিনা। কি খবর, ঘুম হয়েছিল?

ভীষণ।

ওনার কিছু খবর পেলে!

হাজির।

মিছে কথা বলার আর জায়গা পেলে না।

মনোরঞ্জন বাবু বললেন, পরে আসছি। সরল রিসিভারে হাতে রেখে বলল, পরে ডাকব।

কার সঙ্গে কথা বলছেন?

এই একজনের সঙ্গে। তারপর···আসলে এত আচমকা লীনার ফোন যে সে কি বলবে ঠিক করতে পারছে না। একটু এদিক ওদিক করে সময় নেওয়া শুধু। সে বলল' বিকেলে কি করছ?

ওর সঙ্গে বের হচ্ছি।

আবার ইয়ার্কি হচ্ছে!

ডাকব?

ডেকে দাও তো।

এই রূপ!

সরল ক্রমশ অতলে ডুবে যাচ্ছে। সে সব শুনতে পাচ্ছিল—পরেশ দেখত দাদাবাবু কোথায়। বল, আমি ডাকছি। সরলের মুখ লাল হয়ে উঠছে। সে বলল, লীনা প্লিজ ইয়ার্কি রাখ। ততক্ষণে ফোনে লীনা বলছে, এই যে আমার স্বামী রূপ আপনার সঙ্গে আলাপ করবে ধরুন। আপনার সব জানা আছে ওর।

সরলের পায়ের নিচে মাটি নেই। লীনা পরস্ত্রী। পরস্ত্রী কথাটাই বুকে গিয়ে কেমন বিঁধে গেল। দুদিন আগেও লীনা বলে কোন পরস্ত্রী আছে সে জানত না। সে বলল, নমস্কার। আপনি রূপ বাবু।

ইয়েস রূপ বলছি। লীনাতো আপনার খুব ভক্ত। আমিও। লীনাকে আমিই আপনার গল্পের কথা বলি। আমাদের হয়ে তবু একজন বাঙ্গালী লেখক লিখছে—কি জগৎ বলুন। এতদিন এটা কেউ এক্সপ্লোরই করে নি। আচ্ছা আপনি জাহাজের কাজ ছেড়ে দিলেন কেন বলুনতো। কেউ ছাড়ে!

সরল এত কথার একসঙ্গে জবাব দেবে কি করে! সে বলল, আপনিও ছেড়ে দিন না।

মরে যাব।

লীনাতো পাগলের মতো হয়ে যায় আপনি ঠিক সময়ে না এলে। একা বেচারার কাটে কি করে ভেবে দেখেছেন।

লীনার জন্যে কত চিঠি লিখি। কত সুন্দর সুন্দর চিঠি। ছেড়ে দিলে লীনা জীবনেও আর অমন সুন্দর চিঠি আমার কাছ থেকে পাবে না।

সরল ভেবে দেখল, নিয়তিকে সে কোনদিন একটা চিঠি লিখেছে

কিনা। সুন্দর চিঠিতো দূরে থাক, চিঠিই লেখেনি। বিয়ের পরই যতবার শ্বশুরবাড়ি, সঙ্গে সে থেকেছে। না একটা দিনও সে নিয়তিকে ছেড়ে থাকেনি। ছয়সাত বছরের মতো হয়েছে তার বিয়ে। খুব অল্পবয়সে সে বিয়ে করেছে—নিয়তির সঙ্গে দেখা হয়েছিল একটা কাগজের অফিসে। নিয়তিকে প্রায় বালিকাই বলা চলে তখন। এই আঠার বিশ হবে বয়স। একটা কবিতা ছাপার জন্য সম্পাদকের টেবিলে ঘুর ঘুর করছিল।

এবং তখনই আলাপ। প্রায় তাকে দেখে নিয়তির মাথা ঘুরে গেছিল। ঠিকানা নিয়ে একদিন পত্রাঘাত। এবং এক পত্রাঘাতেই সরল টলে গিয়েছিল। তারপর স্বাভাবিক ভাবে দেখাশোনা—মা বাবা দেখল, দাদারা দেখল, ঠিক হয়ে গেল একদিন সব। এবং সে জাহাজ থেকে ফিরে এসে কাজটাও পেয়ে গেছিল ভাল। এ-ভাবে এক চিঠির পরই সব কেমন ধরাবাধা জীবন—কোন আর নতুনত্ব সে টের পেল না। সুন্দর চিঠি লেখার জন্য নিয়তি তাকে এতটুকু সুযোগ করে দেয়নি।

রূপ বলল, বিকেলে ওতো আপনার অফিসে আমাকে নিয়ে যাবে বলছে। পাঁচটা ছটা নাগাদ যাব। আপনিতো শুনেছি আটটা অবদি অফিসে থাকেন।

লীনা লীনা বলে ওর চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে। তোমার কি ইচ্ছে। তুমি কি ভাবো! তখন রূপ বলল, আপনার রহস্যময় জাহাজটার পরিনতি এ-ভাবে শেষ করলেন কেন।

না সে আর সত্যি পারছে না। সব খবর এরা রাখে। সে বলল, আর কিছু করার ছিল না।

একটা কথা বলব?

বলুন!

চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে এত ছোট না করলেও পারতেন। সেকেণ্ড ইঞ্জিনিয়ারকে তো খুনই করে বসলেন।

এ-ছাড়া উপায় ছিল না।

আচ্ছা আপনার কি কোন রাগ আছে এই ইঞ্জিনিয়ারদের ওপর ?

রাগ থাকতে যাবে কেন ?

যত লেখা পড়ি সব সময় দেখি আপনি জাহাজের ফাইভার থেকে আবম্ভ কবে সব ইঞ্জিনিয়াবদেব চবিত্র হয় শয়তানের মতো আঁকেন, নয় বড় নিষ্ঠব হয়ে যায়। এটা কেন হয় ?

সবল বলল, ঠিক এটা ভেবে দেখিনি। আসলে সবল এটা খুবই ভেবে দেখেছে। লীনাব স্বামীব হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবাব জন্য শুধু সে বলল, এটা ভেবে দেখিনি। এবং এত প্রশ্নেব সম্মুখিন এক সঙ্গে সে কখনও হয়নি। তাব মনে হল যেন লীনার স্বামী দীর্ঘদিন ধবে তাবই খোঁজে ছিল এবাব হাতেব কাছে পেয়ে গিয়ে একের পব এক সাবা জীবনেব প্রশ্ন একসঙ্গে কবে যাচ্ছে।

রূপ বলল, আমবা কিন্তু যাচ্ছি।

কেমন নিরাসক্ত গলায় সবল বলল, আসুন।

লীনা তখন ফোন প্রায় কেড়ে নিয়েছে। —কথা রাখছি।

কি কথা ?

এই যে বলেছিলাম এলে আলাপ করিয়ে দেব।

ভাল করেছ।

আপনার কিছু হয়েছে ?

কি হবে ?

এই যে কেমন কাঠ কাঠ কথাবার্তা বলছেন। কেমন নিস্প্রাণ।

এখন যেন লীনার হাত থেকে পরিত্রাণ পেলে সে বাঁচে। বলল, লীনা তোমরা এলে খুব খুশী হব।

সত্যি বলছেন তো !

লীনাকে সে টুক করে বলল, সব বলে দেব কিন্তু।

বলুন না।

তোমার এত সাহস কি করে হয় বুঝি না।

ও বিশ্বাসই করবে না।

সাধ্বি রমণী।

তা বলার দরকার নেই।

এখন কি রূপ লীনার পাশে আছে! সরল গলা [illegible]কসে বলল, যদি বলি কুলটা!

কুল কোথায়। সেটা কি আমাদের কালে আছে!

রূপ কোথায়! লীনা বলল, বাইরের ঘরে।

এই।

কী!

হল।

হ্যাঁ হয়েছে।

শান্তি।

খুব। খু উ ব।

তারপরেই লীনা ফোন ছেড়ে দিল। সরল ফোন হাতে নিয়ে বসে থাকল। এটা যে রেখে দেওয়া দরকার তার যে ফাইল উপচে পড়ছে টেবিলে কিছুই খেয়াল নেই। পরস্ত্রীরা কি সুন্দর হয়! নিয়তি তুমি কিছুদিনের জন্য পরস্ত্রী হয়ে যাও। আমি তোমার সঙ্গে নতুন করে আবার প্রেম করি। পুরোনো অভ্যাসের রাজত্বে আর ফিরে যেতে ভাল লাগছে না।

আর তখন নিয়তি সংসারের সব কাজ সেরে ফেলেছে। স্নান করেছে। পাটভাঙ্গা শাড়ি পরেছে। কপালে বড় করে সিঁদুরের টিপ। সিঁথিতে লম্বা লাল দাগ সূর্যাস্তের মতো অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। আয়নায় দাঁড়িয়ে ফিটফাট হয়ে খাবার টেবিলে। তারপর ঘণ্টাখানেক দিবা নিদ্রা। ঠিক তিনটে বাজলে মোড়ে গিয়ে দাঁড়াবে। এবং গাড়ি করে বুনোকে দিয়ে গেলে হাত ধরে হাঁটতে থাকবে। অ্যান্টিদের গল্প, সহপাঠীদের গল্প, নালিশ, এবং রাজ্যের কথা। বুনোর

কথার ভাণ্ডার ফুরোয় না। খুব মনোযোগ দিয়ে সব শুনতে হয়। এতটুকু আনমমা হতে পারে না। আসলে এই মেয়েটা পেটে আসার পর থেকেই তার কেমন একটা আলাদা জগত তৈরি হয়েছে। কোন পুরুষের দিকে ভালভাবে তাকাতে পর্যন্ত পাবে না। রহস্যময় এক অমঙ্গল চারপাশে তার ঘিরে থাকে। সে ভয় পায়, বেশিদূর আর ভাবতে পারে না। জীবনটা যে এখানে এসেই থেমে যায় মেয়েদের, সে সেটা অনেকদিন আগেই টের পেয়েছে। ওর বন্ধুদেব মধ্যে শুভেন্দুকে ওর ভাল লাগত। এবং শুভেন্দু এলে আশ্চর্য এক উষ্ণতা অনুভব করত একসময়। এই পর্যন্ত। শুভেন্দুর বিয়ের পর সেটাও তার কেমন মরে গেছে। কোন আর আকর্ষণ বোধ করেনা, শুভেন্দুর কোন খবরে।

এইভাবে জীবন কাটে নিয়তির। সে বিকেলটা বুনোকে নিয়ে কাটিয়ে দেয়। তার ইউনিফরম থেকে আবম্ভ করে টাসকের খাতা পড়াশোনা এবং বায়নাক্কা মেটাতেই সন্ধ্যে হয়ে যায়। তারপর রাতের খাবার, ঘর দোব সাজিয়ে রাখা, এবং পাতাবাহারের গাছ-গুলোর জল ঢেলে ধুলো ময়লা পরিষ্কাব করা—নিয়তি কোথাও এতটুকু ময়লা লাগাতে দেয় না। ওর স্বভাবেই আছে সাফসোফ থাকা। কি জীবনে, কি যাপনে সর্বত্র এটা সাত বছর ধরে অনুসরণ করে চলেছে। তবে তার সামান্য সংশয় থাকলে, বোধ হয় ভাল হত। কারণ সন্ধ্যায় রূপ আর লীনা কোম্পানীর দরজায় দাঁড়িয়ে। দরজা খোলার জন্য নাথু সিং লোহার রডে ঘটাং ঘটাং শব্দ করছে।

লীনা উঁকি দিয়ে বলল, তাহলে এখনও আছেন।

সরল তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

লীনা খুব সাদামাটা শাড়ি পরেছে। খুব সামান্য সেজেছে। বরং রূপ খুবই ফিটফাট। একটু বেটে মতো হলেও বেশ দেখতে। ওরই বয়সী হবে। সে বলল, আসুন, আসুন।

লীনা ভিতরে ঢুকে বলল, আপনার অফিস ঘরটাতো খুব সুন্দর।

সরল ভাবল, এ মেয়ে তার সব কিছুই সুন্দর দেখছে। বাসায় এলে যে-ভাবে সমাদর জানানো যায়, অফিসে সেটা হয় না। ওরা যে কেন বাসায় না এসে অফিসে এল!

রূপ বলল, সরল বাবু অনেকদিন থেকে আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার ইচ্ছে ছিল। সেই দুটো পাখিকে নিয়ে একবার একটা গল্প লিখেছিলেন না! বেশ অনেকদিন আগে। তখন জাহাজে প্রথম সফর আমার। কাগজটা হাতে পেয়েছিলাম সিডনিতে। গল্পটা পড়ে···বলতে বলতে সামনের চেয়ারে দুজনই পাশাপাশি বসল।

সরল এ-সব বানানো গল্পের কথা যতটা পারছে এড়িয়ে গিয়ে সে বলল, চিনে আসতে অসুবিধা হয়নি তো। জায়গাটার ঠিকানা খুঁজে বের করা খুব মুস্কিল।

লীনা বলল, আমরা কিন্তু বসব না। এখুনি উঠব। আপনি আমাদের সঙ্গে যাবেন।

কোথায়।

আমরা একসঙ্গে যাব।

কোথায়।

সে চলুন না।

বাসায় কিছু বলিনি।

ফোনটা দিন আমি বলে দিচ্ছি।

কেউ ধরবে না।

ধরবেনা মানে?

কিছু বাজবে না।

লীনা ঠিক বুঝতে পেরে বলল, তবে কাউকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে দিন।

সরল এবার একটু শক্ত হতে চাইল। কাল থেকে এই মেয়ে

তার ইচ্ছে মতো সরলকে নাচিয়ে বেড়াচ্ছে। সে বলল, আজ থাক। আর একদিন যাব।

লীনা বলল, ওতো পরশু চলে যাবে। হাতে আমাদের একদম সময় নেই।

তুমি চলে যাচ্ছ না তো। বলেই ভাবল, রূপের সামনে এ-ভাবে কথা বলা ঠিক হয় নি। সে চোখ সামান্য তুলে রূপের দিকে তাকাল। রূপ সামান্য হাসল। বলল, বেশি আসকারা দেবেন না। জ্বালিয়ে খাবে।

সরল কেমন মাস্টারি গলায় বলল, না না লীনা বড় ভাল মেয়ে।

এখন উঠুন। আর সার্টিফিকেট দিতে হবে না।

সরল ভেতরে ভেতরে যুদ্ধ করছে। সে রূপ এবং লীনা নামক দুটো অদ্ভুত মানুষের পৃথিবী আবিষ্কারে কেমন গোলমালে পড়ে গেছে। রূপ লীনার স্বামী, লীনা রূপের স্ত্রী ভাবতে কষ্ট হচ্ছিল। মানুষেরতো এখন সাম্রাজ্য বলতে স্বামী না হয় স্ত্রী। এমন একটা সাম্রাজ্যে এত সহজে অধিকার লাভ সরলকে ভারি অধীর করে তুলল। এই মেয়ের লাবণ্য যেন আজ কানায় কানায়—এসেই একবার নিয়েছে রূপবাবু, খোলাখুলি স্বীকার করেছে লীনা—তখন কেমন চোখ মুখ ছিল —এখন শরীরের সর্বত্র সে কি কি ঘটনার সম্মুখীন হচ্ছিল মুহূর্তে চোখের ওপর সব ভেসে গেল। সে আর এক দণ্ড অপেক্ষা করতে পারল না। বাড়িতে খবর পাঠিয়ে দিল—ফিরতে বেশ রাতই হবে।

লীনা ড্রাইভ করছিল। বেশ ভাল হাত। লীনা বলেছিল, আপনি পাশে বসুন। সে লীনার পাশে বসতে ইতস্তত করছিল। সে বলেছিল, পিছনে বসি। তখনই রূপ বলল, না না বসুন না। লীনা ভীষণ ভাল মুডে আছে আজ। তখন সরল বলল, বরং আমরা পুরুষ মানুষ, পেছনের সিটেই ভাল মানাবে। পুরুষদের তুমি

বহন করে নিয়ে যাচ্ছ। বহন শব্দটিতে সরল আরও অধিকতর কিছু ইঙ্গিত করতে চাইল। তখন লীনা বলেছে—তাই হোক। আপনাদের বহন করবার ক্ষমতা আমাকে দিন।

রূপ যেতে যেতে এই শহর এবং তুলনায় পৃথিবীর অন্য যে কোন শহর যে কত পরিচ্ছন্ন তার সম্পর্কে কথাবার্তা বলছিল। এই শহর সম্পর্কে সরলের গর্ব আছে। গর্বটা আর কিছুই নয় –শহরটা এখনও টিকে আছে এটাই গর্বের বিষয়। মানুষের প্রতি মানুষের উদাসীনতা কত এই শহরে না এলে টের পাওয়া যায় না। যেমন গতাকালের পিকনিক থেকে আরম্ভ করে আজকের এই ভ্রমণ সবটাই এ-শহরের পক্ষে বেমানান। এবং বুনোর গাড়িতে স্কুলে যাওয়া, ঢুলতে ঢুলতে তোতাপাখির মতো পড়া কণ্ঠস্থ করা, একটা গোটা বাক্য অন্তত কমপক্ষে দশ থেকে কুড়িবার পড়া তারপর মুখস্থ তারপর আন্টিদের প্রশ্নের জবাব দিয়ে প্রসন্ন রাখা এত অর্থহীন যে মাঝে মাঝে ভাবলে পাগল হয়ে যাবার যোগাড়। ওর সেই নগেন বন্ধুটির মুখ এ-সময় একবার জানালায় উঁকি মেরে গেল। খুবই নীতিপরায়ন ছিল। বিয়ের পর সে একদিন হুম করে পাগল হয়ে গেল। সেও কিছুটা নগেনের মতো। তার কি পাগল হবার কোন আশংকা আছে। তা না হলে যা এত কষ্ট করে সে করেছে সবই মাঝে মাঝে এই শহরের মধ্যে ভেসে যেতে যেতে এত অর্থহীন লাগে কেন। এই যে রাত করে সে ফিরবে—কখনও যে না ফেরে তা নয়, তবু তার মনে হয় নিয়তির ওপর সে টরচার করছে। আবার মনে হয় বেশ করছে। আমি কি দাস। আমি কি দাসখত লিখে দিয়েছি। তবে! এবং যখন লীনা দেখল, পেছনের দুজনই ভারি চুপচাপ, তখন সে রসিকতা করল, কি ব্যাপার তোমরা কি ডুয়েল লড়বে ভাবছ।

সরল বলল, রূপবাবু আপনার কপালে দুঃখ আছে।

রূপ বলল, তা আছে। আছে বলেই মজা।

সরল ঠিক এটাই আজ সকালে ভেবেছে। এই মজা না থাকলে

মানুষের অনেক কিছু হারিয়ে যায়। নিয়তি কি যথার্থই সব হারিয়েছে। তার কি আর বেঁচে থাকার মতো কোন সম্বল নেই। তারপরেই সেই হেসে ওঠার দৃশ্যটা মনে হতেই সে কেমন বিষন্ন বোধ করল। এবং চকিতে যেন সে বুঝল, না নিয়তিকে নিয়েও সে দারুন মজা উপভোগ করতে পাবে। আজই সে ফিবে ভাবল, শুভেন্দুকে নিয়ে সে দুটো একটা ঠাট্টা তামাসা করবে। এবং সে দেখেছে, এখনও সহবাসের সময় শুভেন্দুব কথা উঠলে, ওর শবীরের কথা উঠলে নিয়তি ভীষণ ব্যাগ্র হয়ে ওঠে। এই ওঠাব হেতুটা রূপ এবং লীনাকে দেখে আবিষ্কাবেব মতো মনে হল। আসলে রূপ সবটাই চেটেপুটে খেতে চায়। জীবনেব ষোল আনা বলে একটা কথা আছে, সহবাসে ষোলআনার জন্য আজ বোধ হয় লীনার দরকার পড়েছে সবলকে। এবং রূপ এটা টের পেয়ে গেছে বলেই সে আগুনে খড়কুটো যখন যতটা পাবছে দিয়ে যাচ্ছে। সরল সেই অগুনে এখন শুধু সামান্য খড়কুটো।

সরল তখন বলল, লীনা তুমি আমাকে কতদূর নিয়ে যাবে।

দেখুন না কতদূর নিয়ে যেতে পারি।

গাড়িতো কেবল চালিয়ে যাচ্ছ। এবার কোথাও থামাও।

লীনা ঘড়িতে সময় দেখল। আর আধঘণ্টা ঘুরব। তারপর বসব। গাড়িটা রেসকোর্সের পাশ দিয়ে গঙ্গার পাড়ে পাড়ে চলতে থাকল। বেশ হাওয়া বইছে। নদীর জলে কিছু জাহাজ এবং নৌকা। এই সব জাহাজ সম্পর্কে গাড়ির তিন আরোহীরই যথেষ্ট ধারনা থাকায় কেউ জাহাজ দেখে কোন আর পুলক বোধ করল না। বরং দূরের সব নৌকা, তাদের সামান্য আলো সরলকে কেমন অস্থির করে তুলছে। বড় গভীর সেই আলোর সংকেত। ঠিক নিয়তির মতো—চুপচাপ ধিকিধিকি বুনো আব সরল নামক দু'জন মানুষকে নিয়ে জ্বলে যাচ্ছে। জ্বলে জ্বলে একদিন ছাই হয়ে যাবে নিয়তি

সেটা এখনও যেন বিশ্বাস করে না। জীবনের আসল মজা থেকে সরে গিয়ে বড় বেশি সংসারী হয়ে গেছে।

তারপর লীনা একটা বড় হোটেলের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে বলল, আসুন এখানে নামি। এই বলে নেমে গেল গাড়ি থেকে। ওরা হোটেলের লাউঞ্জে ঢুকে গেল। রূপ তাদের রিজার্ভ করা টেবিলের খোঁজে একজন বয়গোছের লোকের সঙ্গে কথা বলছিল। এবং এখন ঘড়িতে রাত আটটা বাজে। বেশ সাজনো গোজানো একটা বড় হলের মধ্যে এক কোনায় ঠিক তিনটে চেয়ার, তিনটে ন্যাপকিণ, গ্লাস ওবু করা কারু কাজ করা প্লেট। গোটা হলটা জুড়ে মানুষ জন যে যার টেবিলে এসে জড় হচ্ছে। লাল নীল কাগজের ফুল। সামনে একটা মঞ্চের মতো। আর গান বাজনার জায়গা। অর্থাৎ ওরা যখন খাবে তখন নানা বিদেশী সুরে ঐ মঞ্চে কেউ এসে কনসার্ট বাজাবে। এখন মঞ্চটা খালি। ফিস ফাস কথাবার্তা। সুন্দর সব যুবক যুবতীরা কেউ বসে কেউ দাঁড়িয়ে—কেউ টেবিলের খোঁজে। কেউ বেশ আগেই এসে গেছে। সামান্য মদ নিয়ে চুক চুক করে খাচ্ছে। পৃথিবীটা একটা রঙ্গীন জলছবি যেন। অদৃশ্যলোক থেকে ভেনচারের যন্ত্রসঙ্গীত ভেসে আসছিল। এবং সরল তখনই দেখল লীনার নাকে একটা হীরের নাকচাবি। আলোতে চকচক করছে। ওর শরীরটা কেমন কেঁপে উঠল।

লীনা খুব নিবিষ্ট মনে মেনু দেখছিল। বয় এসে দাঁড়ালে বলল ভ্যাট সিকসিটি নাইন তিন গ্লাসে তিন পেগ। লীনা সরলের দিকে একবার আড়চোখে তাকাল। একবার রূপ জিজ্ঞেস করা পর্যন্ত প্রয়োজন মনে করেনি সে খাবে কি খাবে না। অভ্যাস কতটা আছে না জেনেই এমনভাবে অর্ডার দিয়ে দেওয়ায় কিঞ্চিত ক্ষুন্ন হল সরল। সে বলল, আমার অভ্যাস নেই রূপবাবু।

একদিন খেলে কিছু হবে না। লীনা খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথাটা বলল।

গতকাল সে খেয়েছে। আজ বলছে, অভ্যাস নেই। লীনা না হেসে পরল না। একদিনে মানুষের অভ্যাস এতটা পরিবর্তন হয় না। গতকাল ডায়মণ্ড হারবারে সাগরিকায় লীনা যদি না থাকত তবে কথা ছিল। বরং সেই বেসামাল হয়ে পড়বে ভেবে বলেছিল, আমি খাই না। খেতে আমার ভাল লাগে না।

সরল বলেছিল, তোমার মানুষটি কিছু বলে না! তিনি নিশ্চয়ই পছন্দ করেন।

লীনা বলেছিল, ওর ইচ্ছে আমি খাই। মাঝে মাঝে জোর করে। না খেলে রাগ করে। উপরোধে ঢেকি গেলা আর কি!

সরল চোখ তুলতেই দেখল, লীনা ঠোঁট টিপে হাসছে। সে গতকালের কথা ভেবেই হাসছে। ওখানে আমি একা ছিলাম সরল বাবু। এখানে আপনি একা। ভরসা পাচ্ছেন না। ভয় নেই, কিছু করব না। বাড়ির দরজায় পৌঁছে দেব। বলেন তো ভদ্র-মহিলার হাতে তুলে দিয়ে আসব। লীনার হাসিটা এতগুলো কথারই প্রকাশ যেন। সে আর এ-নিয়ে বাড়াবাড়ি করল না। আসলে মনে হচ্ছে, লীনা টের পেয়ে গেছে। ইচ্ছেটা তার ষোল আনা, তবু কোথায় একটা কাঁটা বিঁধে আছে গলায়। নিয়তি এবং বুনো সেই কাঁটা।

সাধারণ সাজ গোছে কোন যুবতী এমন রমনীয় হয়ে উঠতে পারে, এত লোভনীয়, লীনাকে আজ এ-মুহূর্তে না দেখলে বিশ্বাস করা যেত না। সরু দু গাছা সোনার চুরি। গলায় কৃত্তিম মুক্তোর মালা। সাদা জমিন লাল পেড়ে গরদ। কপালে সিঁথিতে সিঁদুর। এবং শরীরে আশ্চর্য একটা স্নিগ্ধ সুঘ্রাণ। সে পাশে বসে আছে। সে এই সুঘ্রাণে কেমন ক্রমে না খেতেই মাতাল হয়ে উঠছে। নিয়তি তুমি আসবে একদিন। আমরা একসঙ্গে একদিন এখানে খাব শুভেন্দু আমাদের পাশে থাকবে। জীবনের এ-দিকটা আমি একেবারেই ভেবে দেখিনি।

লীনা প্রথম বলল, চিয়ারস্।

গ্লাসটা লীনার সঙ্গে ঠেকাতে গিয়ে সরলের ভেতরে এক ঝলক বিদ্যুৎ খেলে গেল। রূপ বলল, হাতে আর একটা দিন সরলবাবু। লীনা যা চায়, আমি তাই করি। যা পছন্দ করে আমি তাই করি। তারপর তো জানেন, সমুদ্র কত বিশাল এবং একঘেয়ে। কি মনোটনি! আপনার তো অভিজ্ঞতা আছে। দুটো দিনের মধ্যে একটা দিন চলে গেল।

দুম করে সরল কেন যে বলে ফেলল, এ-দুদিন আপনারা ঘুমোবেন না!

লীনা বলল, ওতো ঘুমোতেই চায়। আমি দিই না সরল বাবু।

রূপ বলল, মাস তিনেকের মতো বছরে ছুটি থাকে—অথচ তিনটে মাস আমাদের কি-ভাবে যে কেটে যায়। যাবার সময় লীনাকে দেখলে আপনারও কষ্ট হবে।

লীনা বলল, যা যত সব বানিয়ে বানিয়ে বলছে।

রূপ তবু বলে চলল; আর কতদিন পর মাত্র দুটো দিন। জাহাজ নিয়ে পারাদীপ থেকে সোজা লসএঞ্জেলসে ফিরতে ফিরতে তিনমাসের ওপর। এ দুটো দিন লীনার আমি ক্রীতদাস।

লীনা বলল, রূপ তুমি বাজে বকছ।

সরল বলল, রেগে যাচ্ছে।

রূপ বলল, পৃথিবীর কোথাও গিয়ে আমি স্থির থাকিতে পারিনা। শুধু লীনা আর লীনা।

সরল বলল, সত্যি লীনা আর লীনা। বলেই সবটা গলায় ঢেলে দিল। সরলের দেখাদেখি রূপও সবটা ঢেলে দিল গলায়। লীনা বলল, এসব কি হচ্ছে!

তখনই মঞ্চে ড্রাম বেজে উঠল। ব্যাগপাইপ বঙ্গো সব একসঙ্গে বেজে উঠল। তিনটে টেডি বয় ঝাগড়া চুল মাথায় দুলে দুলে

বাজাচ্ছে। একটা অতীব লাস্যময়ী যুবতী প্রায় নাঙ্গা, দুনিয়া চলতে রহে বলে গাইতেই বয় গ্লাস ভরে দিলে লীনা বলল, ধীরে খান সরল বাবু। জীবন বড় দামী বস্তু। আমার বাবাকে দেখে বুঝেছি। তিনি দু হাতে পয়সা উপায় করেছেন। শুধু মা এবং আমি আর কোন তার দায় ছিল না, তবু কেন এত পয়সা বাবা সঞ্চয় করে গেলেন। কার জন্য। তিনি নিজে আমাদের দু'জনের জন্য হেন নিচ কাজ করেন নি যা তার আটকায়। আমাদের সুখের জন্য, আমাদের নিরাপত্তার জন্য তার সমাজের ভালমন্দের দিকে তাকাবার ফুসরত ছিল না। সংসারের দিক থেকে দেখলে এমন সদাসয় নিষ্ঠাবান মানুষ মেলা ভার। আত্মীয় স্বজনের কাছে তার কি সুনাম। এই সুমাম অক্ষুন্ন রাখতে নিয়ে আমার মাকে না ভালবেসেও কেমন দিব্যি ঘর করে গেলেন। যেন দায়িত্বটাই তার কাছে বড় ছিল। এখন আমি বুঝি আমার বাবার মতো নিঃসঙ্গ মানুষের কি কষ্ট। তিনি তাঁর মূল্যবান সময় শুধু টাকা এবং আমার মার পেছনেই নষ্ট করেছেন। আমাদের মতো ভোগের উপকরণ তাঁর ছিল না।

লীনারও গ্লাস শেষ। লীনা বকছে। এক গ্লাসে লীনা এতটা বকতে পারে সরলের বিশ্বাস হচ্ছিল না। লীনা বলল, বয়। বয় এলে গ্লাস দেখিয়ে দিল। লীনা ওদের গ্লাসেও দিতে বলল। রূপ বলল, আমিতো ক্রীতদাস সরলবাবু। আমার শুধু কাজ সেবা করা। লীনার সেবা করে যাচ্ছি।

লীনা বলল, আবার বাজে বকছ। আর পাবে না। সরল বাবু আপনার জন্য···

সরল বলল, আছে তো। খাই। পরে হবে।

ওরা নানারকম কথা বলছিল। বাজনাটা বেশ গভীরে গিয়ে বাজছে। এবং দুটো মাতাল লোক টলতে টলতে একটা টেবিলে কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। একজন বলল, ও দাদা কি খুঁজছেন!

জীবন এসেছে ?

জীবন সে কে আবার !

আরে জীবন, জীবন মানে জীবন। জীবনকে খুঁজে মরছি।

বেশ তো আছেন দাদা। নাচুন।

লোক দুটি সমস্বরে বলে উঠল, নাচব।

এবং বাইরে এই কলকাতা নগরী, ১৯৭৮ সাল এবং ভারতের সর্বত্র গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতার বিজয় কেতন উড়ছে, জরুরী অবস্থা শেষ হয়ে গেছে বছরের মত। জনতা সমস্বরে বলছে আমরা মানুষের স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র ফিরিয়ে দিয়েছি আব কি চাই! টেবিলে টেবিলে রাজনীতি নিয়ে বেশ কথাকাটাকাটি হচ্ছে। চরণ সিং বলেছেন, আমি সন্ন্যাসী নই, প্রশাসক। তিনি গৌহাটী যাচ্ছিলেন নির্বাচনে ভাষণ দেবেন বলে। কলকাতায় এসে দেখেন, তাঁকে বিমান বান্দরে স্বাগত জানাতে একশ লোকও হয়নি। তার মধ্যে বাহাত্তব জনই নেতা। এত বড় ভোট বিপ্লবের ফল এই! এবং তখন শহরে শুয়ে আছে অজস্র ফুটপাতবাসী। আগুন জ্বেলে শীত নিবারণ করছে। হাজার লক্ষ হয়ে যাচ্ছে। এরা একদিন কোটিতে গিয়ে দাঁড়ালেই সংকট। যারা মদ্যপান করছিল, সমাজের নিম্নস্তরের মানুষদের যে আবাস নেই, খাবার নেই তাই নিয়ে কি সমাধান হবে কথা কাটাকাটির মধ্যে যারা মদ্যপান করছিল—তারা চকিতে আবার শুনল—দুনিয়া চলতে রহে···।

তারা ভীষণ চিন্তাশীল ব্যক্তি হয়ে গেছে। ছিটে ফোটা মদ পড়লেই গলায় বুদ্ধ লোকটিও চিন্তাশীল হতে চায়। চোখ বুজে আসে —এবং বোধহয় তখন নগরীর ফুটপাথ এবং জনসংখ্যা তাদের কলিজায় কামড় বসায়। কি হবে, কি হবে—এই দেশের গতি কি। বেকার উপবাস মানুষের কতদিন আর চলবে—সমাজ ব্যবস্থা পাল্টানো দরকার। গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতা যখন ফিরে এসেছে তখন বাকিটাও হয়ে যাবে।

লীনা বলল, আর এক চামচ ফ্রাইড রাইস দিচ্ছি সরলবাবু।

সরল বেশ মাতাল হয়ে গেছে। জিভে স্বাদ নেই। সে বলল, দাও। আচ্ছা রূপবাবু আপনি বুনোসাইরিস গেছেন। বুনোসাইরিস মানে বুনো এয়ার্স।

অনেকবার।

এভিতাতে গেছেন?

এভিতা!

বোনো এয়ার্সে গেলেন, এভিতাতে গেলেন না!

ঠিক জানি না ওটা কোথায়!

আমি এভিতাতে গেছিলাম। এভা পেরুনের কবর আছে ওখানটাতে। পেরুন সরকারের পতনের পর এভিতা দেখতে কেমন হয়েছে আমার খুব জানার ইচ্ছে ছিল।

গোলমেলে কথা সরল আরম্ভ করে দিয়েছে। ঘড়িতে দশটা বেজে গেছে। সবাই ঢুলছিল। কেবল লীনা তখনও জেগে রয়েছে। একবার সে লীনার হাতের চাপ পেল। কেউ যেন বলছে, ওঠা যাক এবার। এখনও কি সেই গানটা বাজছে—দূরে সেই গান, দুনিয়া চলতে রহে···এবং পরে মনে হল শৈশবে কোথাও সে শুনেছিল, যে জন্মায় সে ভাতও খায়। জন্মালে খাবার অধিকার বাঁচার অধিকার। এবং সঙ্গে সঙ্গে সে একটা মিছিল দেখতে পেল—মিছিলে তার হাতে একটা নিশান। লাল সেই নিশানে লেখা আছে মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার চাই। এবং এই বেঁচে থাকার অধিকারের জন্য সমাজে বিপ্লব চাই। বুর্জোয়া সংবিধানের নিপাত চাই। কবে যেন সেই কবে সরল ঠিক মনে করতে পারছে না—সুদূরে সেই মিছিল··· কোন এক কালের গর্ভে সেই মিছিল, মিছিলে সে আর তার বন্ধু বান্ধব—প্রতিটি মানুষের বেঁচে থাকার জন্য চাই বিপ্লব—সরল বুঝতে পারল তার প্রচণ্ড নেশা হয়েছে—প্রচণ্ড নেশা না হলে সে তার সেই জীবনের স্বপ্নকে দেখতে পায় না। কি-ভাবে যে এই বুর্জোয়া সমাজ

তাকে গ্রাস করে ফেলল, সে বলল, লীনা তুমি কি আমার পাশে শোবে!

রূপ বলল, সরলবাবু আপনি না লেখক!

সরল বলল, আমি একটা অধম লেখক! আমার কোন আদর্শ নেই। দুটো দিন আমার কি যে গেছে! তুমি কখনও হালসিবাগান গেছ!

হালসিবাগান।

ওখানে একটা বেশ্যালয় আছে।

সরলবাবু!

আমাকে কিছু বলছ লীনা?

সরলবাবু আপনি আউট।

সে তো অনেকদিন আগেই।

না এই এখন হলেন।

না, সেই যেদিন থেকে ভাল চাকরি পেলাম, নিয়তিকে বিয়ে করলাম সেদিন থেকে আউট। আমার বন্ধুরাও। ভাল চাকরি আর ভাল নারী পেলে সবাই আউট।

না, এখনই আউট হলেন!

না, সেই সেদিন থেকে—যেদিন বৈভবের ঘরে ঢোকার আমার পাসপোর্ট মিলে গেল।

না, না না এখনি আউট হয়েছেন। রূপ লীনার কথায় প্রতিধ্বনি করে উঠল।

সরল বলল, চোউপ। আপনি ক্রীতদাস। ক্রীতদাসের মুখে এ-সব শোভা পায় না।

লীনা বলল, সরলবাবু এবার উঠুন।

গান বন্ধ হয়ে গেল!

আপনি উঠুন। আমরা এবার যাব।

আচ্ছা লীনা?

গাড়িতে বসে বলবেন।

আচ্ছা লীনা তুমি আমার সেই সাপের গল্পটা পড়েছ।

সাপ!

আবে কি নাম যেন দিয়েছিলাম মনে কবতে পারছিনা— ভুজঙ্গ, হ্যাঁ হ্যাঁ মনে করতে পাবছি—ভুজঙ্গ।

না ও-সব লেখা পড়িনি।

আচ্ছা আত্মচরিত পড়েছ?

গাড়িতে বলবেন, এখন উঠুন।

আচ্ছা ক্যালকাটা সো।

বললামতো গাড়িতে বলবেন।

আচ্ছা বলে এবাব সরল মাথা চুলকাতে থাকল। হ্যাঁ মনে পড়ছে--খরা। খবা গল্পটা পড়েছেন?

বলছি ওঠোন। গাড়িতে বলবেন।

আমাব এত ভাল লেখা আপনারা কেউ পড়লেন না!

বলছিতো গাড়িতে বলবেন।

ওগুলোই ছিল আমার আসল লেখা। আমি অমন লেখাই লিখতে চেয়েছি লীনা। কিন্তু কি করে কাবা যে আমাকে অধম লেখক বানিয়ে ফেলল।

লীনা বলল, আমরা কিন্তু আপনাকে ফেলে চলে যাব!

সেটা কতদূর।

অনেকদূর।

রূপ বলল, আপনি সেখানে যেতে পারবেন না।

আমি পারব।

লীনা রূপকে ধমক দিল—আবার?

রূপ বলল, আচ্ছা ঠিক আছে।

লীনা আর সত্যি পারছে না। সেও সামান্য টলছে। অথচ দুজনকে সামলে গাড়িতে ওঠা বড়ই দায়। ফুর্তি করতে গিয়ে সবাই

বেসামাল হয়ে পড়বে বুঝতে পারেনি। রূপতো দক্ষ মদবাজ! অথচ সেও পেল্লায় টেনেছে। আসলে সে নিজেও হিসাব ঠিক রাখতে পারেনি। মনে হচ্ছে সেও একটু বেশিই খেয়েছে।

সহসা কি মনে হতেই সরল চেচিয়ে উঠল, অহো সতীপনা। মদ খাই না। অভ্যাস নেই। সতী আমার পানা দেখাচ্ছে।

লীনার মনে হল সরলবাবু যা করছে তাতে সব ফাঁস করে দিতে পারে। এবং শরীরে আগুন—কতক্ষণে রূপকে নিয়ে শরীর দাবিয়ে দেবে—আর কিনা সরলটা মাতলামি করছে। সে বলল, এই বুঝি ভালোমানুষের লক্ষণ!

সরল তখনই বুঝতে পারল সে সত্যি আজ মাতাল হয়েছে। গতরাতে সে পরিমিত খেয়েছিল—আজ সত্যি বেশি। এবং নিয়তির মুখ মনে হতেই সে উঠে পড়ল। নিয়তি জানালায় দাঁড়িয়ে থাকবে। বুনো ঘুমিয়ে পড়লে নিয়তি একা। ভেতরে কেমন একটা কষ্ট বোধ অনুভব করছে নিয়তির জন্য। এবং চকচকে হীরের নাকচাবিতে, যাবার আগে যদি একটা কামড় দিতে পারত।

লীনা সরলের হাত ধরে বলল, লক্ষ্মী উঠুন তো। আপনার মিসেস কি যে ভাববে!

তিনিই কিছুই ভাবেন না। ভাবলে ভাল হত।

লীনার চেয়েও উদার! রূপ দীর্ঘউটির মতো কথাটা বলেই কিছুক্ষণ হাওয়ায় ঝুলে থাকল।

সরল বলল, দাঁড়াও বাথরুম থেকে আসছি।

রূপ বলল, আমারও পেয়েছে।

ওরা চলে গেলে লীনাও এক ফাঁকে বাথরুম সেরে এসে দেখল, দু'জনের একজনও নেই। কোথায় গেল! হাওয়া! বাথরুমে জড়াজড়ি করে পড়ে নেই ত! না কি অন্য কোন হল ঘরে ঢুকে গেল ভুল করে। পাশে ম্যাড-হাউজ সেখানে উঁকি দিয়ে দেখল—হলটাকে আধা আলো আধা অন্ধকারে রাখা হয়েছে। খুব কাছে না গেলে কারো

মুখ স্পষ্ট দেখা যায় না। লীনা ধৈর্য হারিয়ে ফেলছে। সরল না হয় যেখানে খুশি মরুকগে—তুমি মরতে গেলে কোথায়। হাতে সময় আর কতটুকু। সরল এবং তুমি—দুজনই যদি হারিয়ে যাও তবে আমি কি করি বলত!

সে টেবিলে টেবিলে ঘুরে দেখল, না নেই। সে দু তিনটে হল ঘরে এ-ভাবে ঢুকে খুঁজে এসে যখন পেল না তখন কি করবে বুঝতে না পেরে ভাবল, বাবাকে ফোনে জানায়। রূপ যে কোথায় গেল! অথচ সে বুঝতে পারছে বাবা খুব বিভ্রমের মধ্যে পড়ে যাবে তবে। সে যে কি করে! এবং অগত্যা আর কি করা সে সিঁড়ি ভেঙ্গে নিচে নেমে যেতে থাকল। গাড়িতে গিয়ে বসে থাকবে—যখন ফেরার ফিরবে।

আর নিচে নেমেই দেখল, ওরা দু'জন পাশাপাশি গাড়ির মধ্যে ভালোমানুষের মত বসে আছে। সিগারেট খাচ্ছে। খুব আয়েস করে পায়ের ওপর পা রেখে বসে আছে দু'জন। রূপ বলল, বাথরুমে এতক্ষণ!

লীনা রাগে গজগজ করছিল—একদম অসভ্যতা করবে না। বলেই সে গাড়ি ছেড়ে দিল। এখন আর লীনা একটা কথা বলবে না ভাবল। দুটো মাতালের সঙ্গে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। এবং কথা বললেই কথা বাড়বে। নেশা খোরদের নিয়ে এই হচ্ছে জ্বালা। কত যে দুঃখ থাকে। সরলবাবুর দুঃখ উপচে পড়ছে। যেখানে যাবার কথা ছিল, সেখানে আর যাওয়া হল না। লীনা ঠোঁট টিপে নিজের মনেই হাসল। সবারই ইচ্ছে অনেকদূরে যাবে, তারপর সেটা বাঁশবেড়িয়া না হয় রানাঘাট হয়ে যায়। তবে কেউ কেউ সত্যি যায় সরল। যায় বলেই মানুষ এখনও বেঁচে আছে, টিকে আছে। সে গাড়িটা ক্রসিংএ থামিয়ে এ-মুহূর্তে জীবনের বড় বড় কথা ভাবছে। লাল থেকে হলুদ তারপর সবুজ হতেই সে গাড়ি ছেড়ে দিল এবং ভাবল, সরল তোমাকে তাড়াতাড়ি নামিয়ে আমরা চলে যাব। ঘরে গিয়ে—আ, কি মজা সরল জীবনে—তুমি জান না, এই মাতাল লোকটাকে নিয়ে আমি সারারাত ফুর্তি করব। আমরা দুজনই তেজী ঘোড়া এখন। খুব দৌড়াব।

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

আমি এখন বাড়ি ফিরছি। আমার নাম সরল। রূপ এবং লীনা ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিতে চেয়েছিল, আমি রাজি হয়নি। মনে মনে আমি নিয়তিকে সব সময়ই সমীহ করি। একটি অপরিচিত দম্পতি মাতাল অবস্থায় আমাকে পৌঁছে দিলে নিয়তি সহ্য নাও করতে পারে। অথচ আমি দু'দিন থেকে নিয়তির কিছু অসহ্য ঠেকুক এটাই চাইছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই একই পরাজয়, অথবা বলা যেতে পারে নিয়তির সুখে বিঘ্ন ঘটাইনি।

ফ্ল্যাটের কড়া নাড়ার আগেই দরজা খুলে দিয়েছে নিয়তি। বললাম, বুনো কি জেগে?

নিয়তি বলল, হ্যাঁ।

আমার কেমন ভয় ধরে গেল। বুনো জেগে আছে কেন? ওর তো ঘুমিয়ে পড়ার কথা।

ঘোমাল না। বলল, বাবা আসছে না কেন?

আমি আসি না আসি তাতে ওর কি?

নিয়তি বুঝতে পারল আমি একদম পাড় মাতাল। এই মাতলামিতে প্রথম প্রথম নিয়তি খুব কষ্ট পেত। তারপর নিয়তি কিছু বলত না। কারণ রোজ আমার খাবার অভ্যাস নেই। এ্যালকোহলিক বলতে যেটা বোঝায় তা আমি নই। মাঝে মাঝে, এই বন্ধু বান্ধবদের পাল্লায় পড়ে গেলে অথবা কোন পার্টিতে এক আধদিন একটু বেশিই হয়ে যায়। আর বিয়ের পর থেকেই দেখেছি, নিয়তি আমার জন্য জানলায় দাঁড়িয়ে থাকতে ভালবাসে। খুব উদ্বিগ্ন চোখ মুখ। ফিরে এসেছি শেষ পর্যন্ত এই তার বাবার সৌভাগ্য এমন মনে করতে পারে হয়ত—যে জন্য সে ফেরার পর চুপচাপ আমার সু খুলে দেয় পা থেকে, জামা খুলে দেয় গা থেকে—

বাচ্চা ছেলের মতো প্যান্ট খুলে জাঙ্গিয়া খুলে ~~পাজামা পাঞ্জাবি পরিয়ে দেয়~~। ঠিক ওর একটি পুত্র সন্তান থাকলে যা যা করত, মাতাল হয়ে কখনও ফেরার পর সে তা করতে খুব ভালবাসে। ইদানিং শুধু একদিন জাঙ্গিয়া খুলে দেবার সময় দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। বলেছিলাম, দরজা বন্ধ করলে কেন? তখন সে বলেছিল, বুনো কিন্তু বড় হচ্ছে। একটু রয়ে সয়ে খেও। এই হচ্ছে নিয়তি—কিছু বলে না, কেবল ভয় ধরিয়ে দেয়। বুনো বড় হচ্ছে। এখন কোথাও মাতাল হতে গেলেই কেবল মনে হয় বুনো বড় হচ্ছে। এখন কোন মন্দ কথা ভাবলেই কেবল মনে হয়, বুনো বড় হচ্ছে।

তখনই ও-ঘরে বুনোর গলা, মা বাবা এসেছে?

নিয়তি বলল, তুমি ঘুমোও। এসেছে।

আমি ফিস ফিস গলায় বললাম, ও উঠে আসবে না তো?

উঠে আসতে পারে।

বারান্দায় আমরা দু'জন দাঁড়িয়ে। বাইরে পাতাবাহার গাছগুলিতে জ্যোৎস্না। ভিতরের ঘরে ঢুকব, তখনই নিয়তি বলল, এত কাদা লাগালে কি করে! কি গন্ধ! জামা প্যান্ট সব কাদায় লেপ্টে আছে!

আমার হুঁস হল। গন্ধটা আমিও পাচ্ছি। মনে পড়ল, সেই নালাটা ডিঙ্গোবার সময় ঠিক ঝপাৎ করে কেন যে নালাটাতেই ঝাপ দিলাম। এবং নেশা করলে এটা আমার হয়। বাসায় ঢোকার মুখে নালাটা। যাবার সময় নালাটা ছোট দেখে যাই আর নেশা করে যেদিন ফিরে আসি আমি দেখি ওটা একটা বড় খাল হয়ে গেছে। তখন কথাবার্তা শুরু হয়ে যায় নালাটার সঙ্গে। কত কথা। কিছুক্ষণ দূরে দাড়িয়ে বেশ দৌড়ে লাফ মারার সময় বার বারই হয় পা হড়কে গেছে না হয় সামান্য কাদা প্যান্টে লেগে যায়। নালাটা কিছুতেই রেহাই দেয়না আমাকে। আজ প্রতিজ্ঞা করেছিলাম নালাটা ঠিক ঠিক পার হয়ে যাব। দেখি কে হারে কে জেতে।

নালাটার কাছে এসে বুঝলাম—খুবই প্রশস্ত। দৌড়ে এসে লাফ না দিলে পার হওয়া যাবে না। দৌড়ে এসে লাফ দিতেই নালার একেবারে মধ্যে···বললাম, ওই খালটাতে পড়ে গেছি। লাফ দিয়ে পার হতে গিয়ে খালটাতে ডুবে গেছি।

খাল কোথায় পেলে।

আরে ঐযে বাড়ি ঢোকার মুখে একটা খাল পড়ে না!

ওটাতে পড়ে গেছ!

আস্তে বল, ফিস ফিস করে বল। বুনো শুনবে না? শুনলে কি ভাববে!

পড়লে কি করে। এত নেশা কর, একটা নালা পার হতে পার না!

রোজ আমাকে ভয় দেখায়।

কি যে বলছ!

হ্যাঁ নিয়তি। একটু খেলেই ওটাতে ওল্টে পড়ি। কত সতর্ক থাকি, তবু পার হতে গেলে একটু না একটু ভালবেসে ছুঁয়ে দেবেই।

নিয়তি বলল, হয়েছে। দাঁড়াও। বলে সে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। প্রায় চোরের মতো আমাকে বারান্দার দরজা দিয়ে বাথরুমে ঢুকিয়ে দিল। সেই পাজামা পাঞ্জাবী ওর হাতে।

বুনো তখন ডাকল, বাবা বাবা, তুমি কি করছ? তুমি খাবে না।

নিয়তি বলল, না খাবে না। শরীরটা ভাল নেই।

কি হয়েছে বাবার?

নিয়তি তুমি একটা কি!

বাবা বাবা, তোমার শরীর ভাল নেই কেন, কি হয়েছে?

আমার কিছু হয়নি মা, আমি ভাল আছি।

তুমি অত লম্বা করে কথা বলছ কেন বাবা?

নিয়তি আবার ধমক দিল, ছি ছি তোমার কাণ্ডজ্ঞান হবে কি করে। মাতালের মত মেয়ের সঙ্গে কথা বলছ।

আমি মাতাল কে বলেছে !

কে বলবে। সবাই বলবে।

জান, লীনা আর ওর স্বামী···

ওসব আমি শুনতে চাই না !

কেন শুনবে না। তুমি আমার বউ না।

নিয়তি কি যে করেছ এখন ! আমার সব খুলে দিচ্ছে। ক্ষোভে দুঃখে নিয়তির চোখ জলে চিক চিক করছে। আমার ভারি ভাল লাগল। বললাম, নিয়তি ওরা কি সুখি। পৃথিবীর কত কিছু ওরা জানে। তুমি কিছুই জাননা নিয়তি।

নিয়তি এবার পা ধুইয়ে দিচ্ছে। যেখানে কাদা লেগেছে, সে-জায়গা ধুয়ে দিচ্ছে।

তখনই আবার বুনো ডাকল, বাবা। বাবা !

এই নিয়তি তোমার স্বামীকে ও বাবা ডাকছে কেন ?

রাস্তায় মাতলামি করেছ। বাড়িতে আর নাই করলে।

কে জবাব দেবে, তোমার মেয়ে আমাকে বাবা বলে কেন ?

সে ওকে জিজ্ঞেস কর।

করব ?

কর না। কে বারণ করছে।

না আমি বলছিলাম, তুমি ব্যাপারটা বুঝে দেখনা, বুনো আমাকে বাবা বলবে কেন ? আমি ওর বাবা বুনো জানল কি করে। কেন কেন ? বল। তুমি নিয়তি কিছু না। কিছু না নিয়তি—তুমি কিছু পার না। কিছু জান না। বুনো আমায় বাবা বলে কেন। আমি বুনোর বাবা হই কেন ?

আবার বুনোর গলা—বাবা এত কথা বলছে কেন মা।

নিয়তিও কিছু যেন বলছে—আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি না। ছাইপাশ কথাটা বলে নিয়তি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। আমি নিয়তির দু কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছি। নিয়তি পা তুলতে

বলছে, পা তুলে দিচ্ছি, হাত তুলে দিতে বললে হাত তুলে দিচ্ছি। নিয়তির কাছে আমি সত্যি শিশুর মতো।

সামনের বারান্দাটা আমার খোলা। এবং চারপাশের আকাশ দেখা যায় এখান থেকে। পাশে একটা বড় পার্ক—কিছু গাছপালা, এবং বাড়িঘরের আলো রাস্তার আলো, নক্ষত্রের আলো মিলে কতকাল পর যেন আশ্চর্য এক প্রশান্তি। নিয়তি বলল, এখন আর বাইরে বসতে হবে না। শুয়ে পড়। বুঝতে পারছিলাম, নেশা ক্রমে কমে আসছে। শীত শীত করছে। দুটো দিন কি-ভাবে যে কেটে গেল! লীনা এবং রূপ কি করছে এখন বোঝা যায়। অথচ এই প্রথম ওদের দৃশ্যগুলি মনে হতেই অশ্লীল কথাটা আমার কেন জানি মুখ থেকে বের হয়ে গেল। অথচ জীবন এটা চায়, জীবন কত কিছু চায়। নিয়তিকে তখন ডাকলাম। নিয়তি কাছে আসলে বললাম, আচ্ছা নিয়তি তোমাকে কিছু কথা বলব। সত্যি সত্যি জবাব দেবে।

নিয়তি বলল, এখন ওঠোতো আগে। এস শুয়ে পড়বে। ঠাণ্ডা লাগিয়ে ভোগান্তির শেষ কর না। বলে সে হাত ধরে টানতে থাকল।

আমার কিছু বলার ছিল নিয়তি।

কাল বলবে।

আজ না বললে, কাল কথাটা ভুলে যাব।

ভুলে গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।

ওটা নিয়তি মহাভারতেরই প্রশ্ন।

ওঠো। কত আর জ্বালাবে।

তুমি ভাবছ আমি এখনও মাতাল আছি।

কিছুই ভাবছি না। তুমি না শুলে আমি শুই কি করে।

নিয়তিকে জড়িয়ে ধরলাম।

ভিতরে এস। নিয়তি আমাকে ভিতরে নিয়ে গেল। আলো নিভিয়ে দিল নিয়তি, আমার শরীর ঢেকে দিল। আমি এবং নিয়তি। বুনো ঘুমিয়ে পড়েছে। নিয়তিকে বললাম, তুমি আমাকে ভালবাস

না। আমি যেখানে সেখানে যাই তুমি বাঁধা দাও না। তোমার কোন আকর্ষণ নেই।

তুমি ঘুমোও। আমি উঠছি।

না সত্যি করে বল, তুমি আমাকে ভালবাস কি না।

বাসি বাসি। হল ত।

নিয়তি বুনোর কাছে চলে গেল। আমি আবার একা। আমার জগতে এখন আবার কত নক্ষত্র। অথচ একটা নক্ষত্রই সব সময় বড় বেশি টানে। বুঝতে পারি জীবনের ক্ষেত্রে মানুষের একটা দুটো নক্ষত্র হলেই চলে যায়। আর বেশি চাইতে গেলেই জীবনের বিড়ম্বনা বাড়ে।

॥ সমাপ্ত ॥